স্বামী বিবেকানন্দ

জীবন চরিত

প্রথম খণ্ড।

"One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name."

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অনুমত্যনুসারে উক্ত আশ্রম হইতে
প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থাবলম্বনে

শ্রীপ্রমথনাথ বসু

প্রণীত।

আষাঢ়

[মূল্য ২৲

প্রকাশক—

ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার

কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,

৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২২৭।২২

ভূমিকা।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া এবং ভারতের নানাস্থানে মঠ সেবাশ্রমাদি স্থাপন দ্বারা স্বদেশবাসীকে ধ্যান-ধারণা ও দরিদ্রনারায়ণসেবা শিক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়া বর্ত্তমান কালে সমগ্র জগতেরই বিশেষরূপ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারত তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগপূর্ণ জীবনাদর্শে ও অদ্ভুত কৃতকার্য্যতায় গৌরব অনুভব করিয়াছে—বিশেষতঃ বাঙ্গালা জাতি, কারণ তিনি স্বয়ং বাঙ্গালী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পূত জীবনচরিত আলোচনায় যে সমগ্র জগতের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইবে, ইহা অতিশয় স্বাভাবিক।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সংস্রবে আসিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের এই প্রিয়তম ও প্রতিভাবান্ শিষ্যের গুণগ্রামের কথা কিছু কিছু অবগত হই। তখন তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাহার কিছু পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থানে পরিব্রাজকভাবে ভ্রমণ করিয়া কঠোর তপস্যা ও সাধন-ভজনের দ্বারা নিজ গুরুদেবের আদিষ্ট কার্য্যভার সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের নিকট মধ্যে মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার কথা শ্রবণ ও তিনি এখন হৃষীকেশের তপোভূমে সাধনে নিযুক্ত বা এখন অমুক স্থানে রহিয়াছেন, এইরূপ সামান্য সংবাদ জানা ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানিবার সুযোগ এবং সত্য কথা বলিতে কি, বিশেষ আগ্রহও হয় নাই। কিন্তু

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই জগদ্বিখ্যাত চিকাগো ধর্ম্মমহামেলায় যখন তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রকাশিত হইল, তখন হইতেই বিশেষভাবে তাঁহার জীবন ও উপদেশের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন হইতে সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত হইতে লাগিল অথবা তৎসম্বন্ধীয় বা তৎপ্রণীত যে কোন পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাই শুধু সাগ্রহে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম তাহা নহে, তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের নিকট হইতেও তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে লাগিলাম এবং তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য ত্যাগ ও তপস্যার কথা, অপূর্ব্ব গুরুভক্তি, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ উদার মতসমূহের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। পরিশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন, তখন প্রথম শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার অপূর্ব্ব তেজোময় প্রতিভাদীপ্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া তিনি যে আলোকসামান্য মহাপুরুষ তদ্বিষয় প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম।

এই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বামীজির লীলাসম্বরণের সময় পর্য্যন্ত (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই) নানাস্থানে তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশামৃত শুনিবার এবং ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আমার মঠে যোগ দিবার পূর্ব্বে কাশীপুরের উদ্যানে যখন স্বামীজি অবস্থান করেন, তখন উপর্য্যুপরি কয়েকবার এবং তদানীন্তন আলমবাজার মঠে যোগ দিবার কিছু পরেই তাঁহার দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ও আলমোড়া যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ মঠে ৪।৫ দিন মাত্র তাঁহার সঙ্গলাভ করি। (এই সময়কার কিছু কিছু বিবরণ বহু পরে 'স্বামীজির অস্ফুটস্মৃতি' নাম দিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ করিয়াছি)। পরে ঐ বৎসর ৺পূজার পর লাহোরে তাঁহার

সঙ্গে মিলিত হইয়া তথা হইতে দেরাদুন, সাহারাণপুর, দিল্লী, আলোয়ার জয়পুর ও খেতড়িতে তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করি। খেতড়ি হইতে পৃথক্ হইয়া একমাস পরে পুনরায় কলিকাতায় তাঁহার সহিত মিলিত হই। ১৮৯৮এর প্রথম ভাগে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাটীতে মঠ উঠিয়া যাইলে কয়েকমাস তথায় তাঁহার সহিত একত্রবাসের সৌভাগ্যলাভ করি। তারপর তিনি কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া নাইনিতাল হইয়া আলমোড়ায় গমন করিলে আমিও মাসখানেক পরে তথায় ৪।৫ দিনের জন্য মিলিত হই। তাঁহার কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আবার কখনও কলিকাতায়, কখনও মঠে (ইহারই কিছু পরে বেলুড়ে স্থায়ী মঠবাটী নির্ম্মিত হয়) তাঁহার সঙ্গ ও সাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটিতে থাকে। ১৮৯৯ সালের জুনে তাঁহার দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমনের সময় প্রিন্সেপ ঘাটে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আবার যখন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রি ৯টার সময় কোন সংবাদ না দিয়াই তিনি হঠাৎ মঠে প্রত্যাগত হন, তখন আবার তাঁহার দর্শন লাভ হইল। ইহার পর অধিকাংশ সময় তিনি মঠে যাপন করিয়াছেন—আমিও বিশেষ কারণে বাহিরে না যাইলে তাঁহার সঙ্গলাভ করিতাম। ইতিমধ্যে স্বামীজি যে কয়েকবার মঠ ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন, তাহার মধ্যে ঢাকা যাত্রার সময় তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। অবশেষে যেদিন আমাদের কাঁদাইয়া তিনি মহাসমাধি প্রাপ্ত হইলেন তখনও তথায় উপস্থিত ছিলাম।

স্বামীজির জীবনের যে সামান্য অংশ সম্বন্ধে আমার কতকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহার নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনের ঘটনাবলী কি কি উপাদান হইতে প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

মঠে আশ্রয় লইবার পর হইতেই স্বামীজি আমাদিগকে মঠের দৈনন্দিন কার্য্য-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে বার বার আদেশ করিতেন। আমরা সকল সময়ে না পারিলেও অনেক সময়ে তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলাম। তৎফলে মঠের অন্যান্য অনেক ঘটনাবলির সঙ্গে স্বামীজির অনেক কথা, অনেক উপদেশ এবং তাঁহার জীবনের কতক কতক ঘটনা ও বিভিন্নস্থানে গতাগতিরও কতক কতক বিবরণ তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া মঠে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

স্বামীজির মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া বেলুড় মঠে সমবেত হন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বামীজির সম্বন্ধে যিনি যাহা জানিতেন, তাহা বলিয়া গিয়া আমার দ্বারা লিপিবদ্ধ করান। পরে উদ্বোধনের সম্পাদনকালে স্বামীজির জীবনের উপাদান সংগ্রহের জন্য পাঠকগণের নিকট আবেদন করায় স্বামীজির বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ, আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে দীক্ষিত বেলগামনিবাসী ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, স্বামীজির অন্যতম প্রিয়শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তাঁহাদের স্বামীজি-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন।

স্বামীজির পাশ্চাত্যদেশবাসিনী বহুগুণালঙ্কৃতা শিষ্যা, ভগিনী নিবেদিতা বোধ হয় স্বামীজির একখানি সুবিস্তৃত জীবনী সঙ্কলনের মানস করিয়া তাহার অংশ বিশেষ স্বরূপে মায়াবতী হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ-ভারত' নামক ইংরাজি মাসিকে 'The Master as I Saw Him' নাম দিয়া স্বামীজি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে লিখিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয়, অকালে দেহত্যাগ করাতে স্বামীজির সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখা তাঁহার দ্বারা ঘটিয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের ভারগ্রহণের

পর স্বামীজির একখানি সুবৃহৎ সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখিবার কল্পনা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে উপরে উল্লিখিত ডায়েরি এবং মুদ্রিত বিবরণ সমূহ ব্যতীত নানাস্থান হইতে নানা ব্যক্তিকে লিখিয়া নানা ঘটনা সংগ্রহ করেন এবং এইরূপে স্বামীজির সুবৃহৎকায় চারিখণ্ড ইংরাজী জীবনচরিত সঙ্কলিত হয়। ভবিষ্যতে যিনিই স্বামীজির জীবনচরিত রচনার প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাকেই প্রধানতঃ ইহাই উপাদানরূপে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ জীবনচরিত মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ ও আমি উহার হস্তলিপি দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ও যাহাতে উহাতে বর্ণিত ঘটনাগুলিতে অতিরঞ্জন না থাকে বা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে নানা উপায়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলাম।

জনৈক উদ্যোগী প্রকাশক মায়াবতীর অধ্যক্ষগণের অনুমতি লইয়া খণ্ডাকারে বিস্তৃতভাবে স্বামীজির জীবনচরিত মারাঠি ভাষায় প্রকাশ করিতে বহুপূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছিলেন; উহা ঐ ইংরাজী গ্রন্থের একরূপ যথাযথ অনুবাদ এবং উহার প্রকাশকার্য্য এখনও চলিতেছে, বোধ হয় শীঘ্রই উহা সমাপ্ত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ স্বামীজির উপদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিলেও বাঙ্গালা ভাষায় দুই-একখানি অতি ক্ষুদ্র জীবনচরিত ব্যতীত বিস্তারিত জীবন-চরিত লিখিবার চেষ্টা বিশেষ দেখি নাই। প্রায় দুই বৎসর হইল, বর্ত্তমান গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বসু মহাশয় স্বামীজির ইংরাজী জীবনচরিতের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে দেখান এবং তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও গুছাইয়া বেশ মিষ্ট করিয়া বলিবার শক্তি দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সমগ্র জীবনচরিতটী লিখিবার চেষ্টা করিবার

জন্য উৎসাহিত করি এবং কি ভাবে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিলে ভাল হয়, তৎসম্বন্ধেও কতগুলি পরামর্শ দিই। সম্প্রতি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থখানি লেখা শেষ হওয়ায় উহা প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়া আমাকে একটী ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন—তদুপলক্ষে আমি এ পর্য্যন্ত উহার হস্তলিপির অধিকাংশ ভাগ শ্রবণ করিয়াছি এবং আমার স্বামীজির জীবন সম্বন্ধে যতটা জানা আছে, তৎসহায়ে এবং মঠের ডায়েরি ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া ঘটনার বর্ণনার মধ্যে যাহাতে অসত্য প্রবেশ না করে, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

প্রমথবাবু মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে স্বামীজির বিস্তারিত ইংরাজী চারি খণ্ড জীবনচরিতের অনুবাদ করিবার অনুমতি যথাবিধি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে গিয়া সকল স্থলে ধারাবাহিক ও আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেন নাই, কেবল যাহাতে ঘটনাগুলির একটীও বাদ না পড়ে তদ্বিষয়েই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। গ্রন্থ সংশোধনকালে তিনি আরও বিশুদ্ধ করিবার জন্য পুরাতন উদ্বোধন, স্বামি-শিষ্য-সংবাদ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ হইতে স্বামীজির জীবনচরিতের অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি আবার মিলাইয়া দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের পঞ্চমভাগ হইতে স্বামীজির বাল্যজীবন সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলি যথাযথ বর্ণনামাত্র করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দার্শনিকভাবে স্বামীজির জীবন বিশ্লেষণ করা বা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীরতার পরিমাণ কতদূর, গ্রন্থকার সে দিকে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, তদপেক্ষা উচ্চতরশক্তিসম্পন্ন

লেখকের জন্য সেই কার্য্য রাখিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার দ্বারা স্বামীজির জীবনালেখ্যখানি যথাযথ চিত্রিত হইয়া থাকে, তবেই তিনি নিজ শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

আমরাও তাঁহার পুস্তকের শুদ্ধতা সম্বন্ধে যেটুকু সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেটুকুও বড় বেশী নহে, এবং হলফ করিয়া এ কথাও বলিতে পারি না যে, ঘটনা-সন্নিবেশে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নাই, তবে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করাতে ইহা অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তৎপ্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতে Dialogic Process নাম দিয়া মহাপুরুষগণের জীবনচরিতে তাঁহার শিষ্যগণের ভক্তির আতিশয্যে যে অনিচ্ছাকৃত অতিরঞ্জনাদি দোষ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, স্বামীজির ইংরাজী জীবন-চরিতের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের হস্তলিপির আলোচনাকালে বিশেষ অনুসন্ধান অবলম্বন করাতে তাহার হস্ত হইতে কিয়ৎপরিমাণেও মুক্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবি করা যাইতে পারে, কারণ, স্বামীজির জীব-নের যে সকল ঘটনা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল, অনুসন্ধানের ফলে তাহারও কতক আমার ধারণা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন, অতি-রঞ্জিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আরও স্বামীজির কিছুকাল পূতসঙ্গের ফলে তাঁহার যে একটী ছবি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত কিছু পার্থক্য বোধ হইলেই লেখককে সেইটী স্মরণ করাইয়া দিয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

যাহার যেরূপ ধারণা, যাহার যে দিকে ঝোঁক, মহাপুরুষের জীবনা-লোচনাকালে সেই দিকটীই তাহার দৃষ্টিতে বিশেষভাবে নিপতিত হয়। সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামীজিকে দরিদ্রনারায়ণ-

সেবাব্রতপ্রচারক, জাতীয় ভাবের উদ্বোধক, সমাজসংস্কারক, প্রাচীন ভারতের গৌরবঘোষণাকারী প্রভৃতি নানাভাবে বর্ণিত দেখিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটিকেই স্বামীজির সমগ্র ভাবের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না। তাঁহাতে এই সকলগুলিই ছিল এবং আরও অনেক জিনিস ছিল। স্বামীজির ধারাবাহিক জীবনচরিত পাঠে তাঁহার এই বৈচিত্র্যময় জীবনের সমগ্র ভাবটী অনেকটা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং বর্ত্তমান গ্রন্থালোচনে ইহার বিশেষ সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণে পাঠকগণকে গ্রন্থের আলোচনায় উন্মুখ জানিয়া এবং গ্রন্থের গুণদোষ বিচারের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা বিরত হইলাম।

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥

উদ্বোধন কার্য্যালয়,
শ্রাবণ, ১৩২৬।

ইতি—
নিবেদক—শুদ্ধানন্দ।

অবতরণিকা

যে মহাপুরুষের পুণ্যচরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি বর্ত্তমানযুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই নররত্ন বাঙ্গলাদেশে ও বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা ধন্য। কিন্তু তাঁহার কার্য্যাকলাপ বাঙ্গালাদেশের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি লোক-কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের মহিমা প্রচার এবং অলৌকিক সদ্‌গুণরাশি প্রদর্শন করিয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন জড়বাদ ও নাস্তিকতার বিষম প্লাবনে এ দেশ ভাসিয়া গেল, যখন প্রাচীন ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন, যখন খ্রীষ্টীয় মিশনরিরা পৌত্তলিক বলিয়া আমাদিগকে উপহাস ও আমাদের দেবদেবী ও পূজাপদ্ধতিকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, তখন ধর্ম্মের অধঃপতন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবলোকন করিয়া প্রাচীনের উপর লোকের একটা অভক্তি জন্মিয়া গেল এবং একে একে প্রাচীনভাব ও সংস্কারগুলি তাঁহাদের মন হইতে উৎপাটিত হইতে লাগিল। এই মহাযুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিভাশালী রাজা রামমোহন রায় প্রাচীন ধর্ম্মের সারাংশ অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই ধর্ম্মের উদার মত কিয়ৎপরিমাণে নাস্তিকতার দিক্ হইতে লোকের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু লোকে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম হইয়া সাম্যবাদের দোহাই দিয়া সামাজিক স্বাধীনতার নামে আহার-বিহার ও বিবাহাদি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার অবলম্বন

করিল। ইহাতে নব্যতন্ত্রের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রাচীন ধর্ম্মের জীর্ণস্তূপের আশে পাশে যে সকল ব্যক্তি সন্দেহ-দোলায়িত চিত্তে অজ্ঞেয়বাদের অন্ধকারে ঘুরপাক খাইতেছিলেন ও কোন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া অন্তরে অন্তরে ঘোর শাস্ত্র বিদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন সাম্যমন্ত্রবাদী খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মরাও দোষলেশশূন্য পূর্ণমানব নহেন। তখন ধীরে ধীরে লোকের মনের গতি বিপরীত দিকে ফিরিল। কিন্তু তথাপি ঈশ্বর আছেন কি না বা হিন্দুধর্ম্মোক্ত সকল কথাই বিশ্বাসযোগ্য কি না—এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ ঘুচিল না। এমন কি পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত নাকি বলিয়াছিলেন 'ও সব কিছু বুঝি না।' কিন্তু ইতিমধ্যে আর একদল থিয়োসফিষ্টদের ভাব লইয়া বৈজ্ঞানিক ধরণে হিন্দুধর্ম্মের নবব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন এবং সাহেবদিগের টীকা টীপ্পনীর সাহায্যে গীতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দু' একজন টোলের পণ্ডিতও বিজাতীয় সাহায্য ব্যতিরেকে এই পন্থা অবলম্বন করিলেন। ইহা ভাল কি মন্দ সে কথায় প্রয়োজন নাই, তবে ইহা দ্বারা এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, কতিপয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কোন সত্য আছে কিনা তাহারই নির্ণয়ে সযত্ন হইয়াছিলেন। ইহাতে পুরাতন গ্রন্থাদির কতক গ্রহণ করিয়া ও কতক প্রক্ষিপ্তবোধে বাদ দিয়া একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। বঙ্কিমবাবু, শশধর তর্ক-চূড়ামণি প্রভৃতি মনীষিবৃন্দকে এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রণালীর প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে বাঙ্গালার এক নিভৃত পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের জন্য এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। এই ঐশীশক্তিসম্পন্ন, ধর্ম্ম ও সত্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, অতিলৌকিক দেবমানবের কথা আর কি বলিব? ইনি বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মবিপ্লব

হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বোধ হয় আজ বাঙ্গালাদেশে এমন হিন্দুসংসার নাই যেখানে লোকে প্রাতঃ সন্ধ্যা ভক্তিভরে তাঁহার নাম স্মরণ না করে এবং এমন গৃহ নাই যেখানে তাঁহার অন্ততঃ একখানিও প্রতিকৃতি না দেখা যায়। তাঁহার অবির্ভাবে সমগ্র জগৎ ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ইনি যখন প্রাণপণ সাধনা দ্বারা সকল ধর্ম্মের সত্যতা প্রদর্শন ও সমন্বয় বিধান করিলেন তখন বাঙ্গালার ইংরাজী শিক্ষিত দলের মুখপাত্রগণ একে একে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তিগণ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় বিজ্ঞানবাদী, হেষ্টী সাহেবের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দেশমান্য পণ্ডিতগণ একে একে তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহর সহিত আলাপ করিয়া ধন্য ও বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ইনি স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়া দেখাইলেন যে উপনিষদুক্ত নিরাকার ঈশ্বরও সত্য, আবার কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি সগুণ ঈশ্বরও সত্য। এমন কি পুরাণোক্ত দেবদেবী-লীলা পর্য্যন্ত মিথ্যা নহে। এই মহাপুরুষের অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভা দর্শনে অনেকে এক্ষণে ইঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথায় প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু দেখিব তাঁহার জন্মগ্রহণে ধর্ম্ম-জগতে কি নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। এটী বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার জীবনটী দেখিলেই হইবে না। তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত আর একটী জীবনও বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে। সেটী হইতেছে পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী।

কারণ প্রধানতঃ বিবেকানন্দ স্বামীর মধ্য দিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমূহ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার জীবন হইতে বিবেকানন্দকে বাদ দেওয়া চলে না। বিবেকানন্দ স্বামীর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন অলোকসামান্য পুরুষ জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের জুলিয়াস সীজার, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও ইদানীন্তন কালের মহাবীর নাপলেয়ঁ প্রভৃতি ২।৪টী মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শক্তিশালী পুরুষ বোধ হয় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সঙ্গীত, শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য—এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাগ্মী, মেধাবী, কর্ম্মকুশল, ক্রীড়া-কৌতুক-রহস্যনিপুণ, অমল-চরিত্র, আবাল্য-ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ লোকশিক্ষক বোধ হয় জগতে কখনও জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। সকল দিক্ হইতে এমন সুপাত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকের সেই জন্য ধারণা আছে বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত নাম শুধু তাঁহারই জন্য, তাঁহার মত শিষ্য লাভ করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা অনেকেই প্রথমে স্বামীজির আকর্ষণেই আকৃষ্ট হইয়া শেষে তাঁহার গুরুর সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। হইতে পারে স্বামিজীর ন্যায় অদ্ভুত মনস্বী শিষ্য না থাকিলে হয়ত পরমহংসদেবের নাম এত দিনে বিস্মৃতি-সাগরে লীন হইয়া যাইত। কিন্তু যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে শিষ্যের শক্তিতেই গুরুর এত মহত্ত্ব তবে তাঁহাদের মত ভ্রান্ত আর কেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ না হইলে স্বামিজীর ন্যায় গুণবান্ পুরুষ আর যাহাই হউন, যাহা হইয়াছিলেন তাহা কখনই হইতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবই নরেন্দ্রনাথ দত্তকে

বিবেকানন্দ স্বামীতে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বামীজি নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে 'পরমহংসদেব ইচ্ছা করিলে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন।' কারিগর ওস্তাদ, উপাদানও উত্তম, তাই জিনিষটি এত নয়নাভিরাম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ না থাকিলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাহাত্ম্য এত প্রচারিত হইত কি না যাঁহারা সন্দেহ করেন, অপর পক্ষে তাঁহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব না থাকিলে বিবেকানন্দও এরূপ বিশ্ববিখ্যাত হইতেন কি না সন্দেহ। দুইটি জীবন পরস্পর সাপেক্ষ,—উভয়কে একত্রে দেখিতে হইবে, নতুবা এ রহস্যের মর্ম্ম কেহ বুঝিবেন না। গুরুকৃপা, সাধনা ও চরিত্রবলে সত্যের সন্ধান পাইয়া স্বামীজি দেশকে বিপথ হইতে প্রকৃত পথের দিকে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারকের ন্যায় করাল কুঠার হস্তে প্রাচীন সমাজের মূলোচ্ছেদ করা তাঁহার আদৌ অভিপ্রায় ছিল না। তিনি জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা স্বতঃসঞ্জাত সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই সংস্কার সম্পাদনের জন্য আপন উন্নত ও উদার হৃদয়ের প্রেরণায় স্বীয় মুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া অদ্ভুত ত্যাগের আদর্শ শীর্ষে বহন পূর্ব্বক হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিল যে, এদেশের প্রধান অভাব দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য দূর করিতে না পারিলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সংস্কার কিছুই হইবে না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন রাজনৈতিক আন্দোলন বা শাসক সম্প্রদায়ের উপর দোষারোপ করিলেই এই দারিদ্র্য দূর হইবে না। ইহার জন্য দেশের লোককে স্বাবলম্বনপর করা প্রয়োজন। তিনি বুঝিলেন যে এ দেশের লোকের শতাব্দীব্যাপী মানসিক ও নৈতিক জড়তা দূর করিতে হইলে ইউরোপ ও আমেরিকার কর্ম্মশীল জাতিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় হস্ত প্রসারণ করিলে ভিক্ষা ত কেহ দিবেই না, পরন্তু লা

ও অবমাননা অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য তিনি স্থির করিলেন আদান-প্রদান নীতি অবলম্বন করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আমাদের যাহা আছে তাহা ঐশ্বর্য্যশালী পাশ্চাত্য জাতিদিগকে দিব এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের নিকট হইতে শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিব। এইরূপ বিনিময় দ্বারা উভয় জাতির মধ্যে সৌখ্য ও সৌহার্দ্দের বন্ধনও দৃঢ়ীভূত হইবে; অর্থাৎ ধর্ম্মবলে জগতে ভেদ, বৈষম্য, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি দূর হইয়া এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইবে, সকলের মধ্যে আবার মৈত্রী, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার কিরূপ সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সর্ব্বজন-সুবিদিত। কিন্তু তিনি নাম-যশের কাঙ্গাল ছিলেন না; সেখানে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মবীর ইংরাজের দেশে। ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেক মহানুভব ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার ভাব সাদরে গ্রহণ করিল। তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্ত সংস্কার নির্ম্মূল হইয়া অনেক নূতন জ্ঞান জন্মিল। তারপর তিনি সমুদয় ইউরোপখণ্ড ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দেশের রীতি-নীতি সন্দর্শন করিয়া বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন ও তৎসাহায্যে ভারতীয় রীতিনীতির সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য ও কোন্‌টি বর্জ্জনীয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। কয়েকবর্ষ কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন ও এ দেশের লোককে বিশ্ববাসীর আসরে দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই বিপুল পরিশ্রমের ফলে শীঘ্রই পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ও অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে মর্ত্তালোক হইতে প্রস্থান করিলেন। যাহা হউক

পার্থিব দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ও আশা করা যায় কালে আরও সুদূরপ্রসারিত হইবে। তাঁহার আদর্শ অবলম্বন করিয়া আজকাল অনেকে অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের অবতারণা করিতেছেন. ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। এমন কি বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহার ভাবগুলির সাহায্যে আপনাপন সম্প্রদায়কে অধিকতর উন্নত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাতে মনে হয় ভারতে আবার এক নবীন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। সে যুগের প্রবর্ত্তক বা প্রধান পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার ভাব ও আদর্শ, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্বত্র অব্যাহত ভাবে প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ হওয়া উচিত ও বাঞ্ছনীয়। কারণ নিজেদের উন্নতি নিজেদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, আর উহা যতটা বিপথে চালিত না হইয়া ধর্ম্ম ও সৎপথে চলে ততই ভাল।

স্বামীজি যে এইরূপ সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বজনীন সংস্কারকরূপে গৃহীত হইয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন সমাজসংস্কার বা রাজনীতিচর্চ্চা দ্বারা এদেশের উন্নতি সম্ভব নহে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, অহিংসা, নির্লোভতা, নিরহঙ্কার ও কর্ম্মযোগ চিরদিন যে দেশের আদর্শ সে দেশ ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা উন্নত হইবে না। আর সে ধর্ম্ম কতকগুলি লোকাচার ও দেশাচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাহা আর্য্য ঋষিদিগের প্রচারিত উদার বেদান্ততত্ত্ব। তাই তিনি বেদান্তের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষণা করিলেন—অমনি শত সহস্র ধর্ম্মপিপাসুহৃদয় তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বক্তা অনেক আছেন, পণ্ডিত অনেক আছেন, জ্ঞানী অনেক আছেন, কর্ম্মীও অনেক আছেন,

তথাপি এমনটি আর কখনও ঘটে নাই তাহার কারণ কি? তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের অদ্ভুত পবিত্রতা, আত্মশক্তিতে অদম্য বিশ্বাস এবং আচণ্ডালে অকপট প্রেম। এই তিনটি প্রধান গুণ অন্য সকল গুণের ভিত্তিভূমি হইয়া তাঁহার চরিত্রকে এত অনুপম করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এ গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গূঢ়রহস্য বা অধ্যাত্মিক অলৌকিকত্ব লইয়া অধিক আলোচনা করি নাই। সে সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, বা শ্রীম-প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের চতুর্থ ভাগ পাঠ করিলে অনেকে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। আমরা শুধু সাধারণ হিসাবে লৌকিক জগতের দিক দিয়া তিনি যে কত বড় মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পরমহংসদেব তাঁহার সম্বন্ধে যে সব গুহ্য কথা বলিতেন তাহা সাধারণ লোকে সকলে বুঝিতে পারিবেন বা বিশ্বাস করিবেন কিনা সন্দেহ, আমরাও সেজন্য ওসকল কথার অবতারণা করি নাই। তবে ওসকল কথার উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার দেবদুর্ল্লভ চরিত্রের বিশেষত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে; দেখান যাইতে পারে এই অমানব পুরুষের গৌরবে সমগ্র জগৎ গৌরবান্বিত—ইনি মনুষ্যজাতির শিরোমণি। বাস্তবিক এরূপ চরিত্রের লোক আর দুই চারিজন জন্মিলেই বোধ হয় কলির প্রভাব দূর হইয়া শীঘ্রই সত্যযুগের আবির্ভাব হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন উপলক্ষে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ উক্ত আশ্রম হইতে প্রকাশিত স্বামীজির ইংরাজী জীবনীর বঙ্গভাষায় অনুবাদের জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী তাঁহার 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে

আবশ্যকমত ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ও সর্ব্বশেষে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী এই গ্রন্থ যাহাতে কোনরূপে অতি-রঞ্জন দোষে দুষ্ট না হয় ও সত্যঘটনা-পূর্ণ থাকে তজ্জন্য স্বীয় শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া অকাতরে যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ রহিলাম। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইত। এজন্য তাঁহাকে এস্থলে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমি স্বয়ং এই ব্যাপারে শুধু কাষ্ঠ-বিড়ালের কার্য্য মাত্র করিয়াছি বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থখানি তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করিতে যাইয়া বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ স্থানে স্থানে যে ভুল থাকিয়া গিয়াছে তাহা ২য় সংস্করণে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্য আমার ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

ভবানীপুর,
শ্রাবণ, ১৩২৬

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

সিমুলিয়ার দত্তবংশ।

যিনি উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়া নামক স্থানে প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত ও পিতামহের নাম ৺দুর্গাচরণ দত্ত। নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাঁহার পিতা ও পিতামহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি অনুরাগ একপ্রকার তাঁহাদের বংশগত ধারা।

দুর্গাচরণ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সঙ্গীতবিদ্যায়ও তাঁহার সম্যক্ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টের একজন খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তদুপার্জ্জিত অর্থে দত্তবংশের যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি ও পসার প্রতিপত্তি হইয়াছিল। দুর্গাচরণও আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই ধনে মানে পিতার সমকক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিতেন। ধন মান যশঃ তাঁহাকে অধিকদিন সংসারে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের রক্ষণা-বেক্ষণ ভার আত্মীয়স্বজনের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন।

এবং পাঁচ ছয় বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ৺কাশীধামে উপনীত হইলেন। সে সময়ে ৺কাশীধামে যাইতে হইলে পদব্রজে বা নৌকাপথে যাইতে হইত, কারণ তখন এদেশে রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই। দুর্গাচরণের সংসারত্যাগের পাঁচ ছয় বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রী অষ্টমবর্ষীয় শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে বারাণসীধামে যাইতেছিলেন। দেড়মাস পরে তাঁহারা বারাণসী পৌঁছিলেন। পথে নৌকার উপর খেলা করিতে করিতে বিশ্বনাথ জলমগ্ন হইয়াছিলেন এবং পুত্রবৎসলা জননী পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া আপন প্রাণের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মজ্জমান পুত্রের উদ্ধারকল্পে ভাগীরথী সলিলে ঝম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। সেদিন মাতা পুত্র উভয়েরই প্রাণনাশ হইত, কিন্তু বিধিকৃপায় নৌকার মাঝিমাল্লার যত্নে উভয়েই রক্ষা পান। যখন উহারা মাতা পুত্র উভয়কে জল হইতে তুলিল, তখন দেখা গেল, স্নেহময়ী জননী পুত্রের একখানি হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন! বহুকাল পর্য্যন্ত বিশ্বনাথের হস্তে ঐ দাগ ছিল।

তারপর ৺কাশীধামে পৌঁছিয়া দুর্গাচরণ পত্নী বহু দেবদেবী দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। দৈবক্রমে একদিন বৃষ্টি হওয়াতে তিনি ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া যান। জনৈক সাধু তাহা লক্ষ্য করিয়া "মায়ি গির্ গিয়া" বলিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—কে এ সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী যখন মূর্চ্ছিতপ্রায় দুর্গাচরণ-পত্নীকে সযত্নে বহন করিয়া মন্দিরের সোপানে স্থাপিত করিলেন তখন পলকের জন্য চারি চক্ষুর মিলন হইল। উভয়েই উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হা বিধিচক্র! সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বয়ং দুর্গাচরণ।

স্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াই তিনি অস্ফুটস্বরে "মায়া হায় মায়া হায়!" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ত্যাগী পুরুষ! রমণীও ত্যাগশীলা! বহুদিনের পর অকস্মাৎ স্বামীর পবিত্র মুখদর্শনে দুর্গাচরণ-পত্নী আন্তরিক তৃপ্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর তাঁহাকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল না। তিনি মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন এবং নতজানু হইয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিলেন।

* * * *

তাহার পর মাতাপুত্রে ৺কাশীধাম হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। মাতা পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পুত্র খেলাধূলায় কয়েক বৎসর কাটাইয়া অবশেষে বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগ দিল।

সিমুলিয়ার সে দত্তবাড়ী আজও আছে। এখন আর সে পূর্ব্বের গৌরব নাই। সে দেউড়িতে দ্বারবান্ নাই, দাসদাসী, লোকজন, মক্কেল মুহুরী, বন্ধুবান্ধবের নিত্য কোলাহল নাই, সে উৎসব, জাঁকজমক, ব্রতপূজা কিছুই নাই, শুধু বিপুলায়তন প্রবেশদ্বারটী জীর্ণচ্ছাদ ভগ্ন প্রাচীর অট্টালিকার লুপ্ত-গৌরবের ক্ষীণস্মৃতি নীরবে বক্ষে বহন করিতেছে, আর অধিকাংশ জায়গা জমি এক্ষণে অপরের হস্তগত হইয়াছে। গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীটে যাইলে আজিও সে ভগ্নগৃহ প্রত্যক্ষ হয়। তখন ঐশ্বর্য্য ছিল, দত্তবংশের কীর্ত্তি-কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিত; দত্তবাড়ী চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীমধ্যে সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিত—সকলেরই সুপরিচিত ছিল। আর আজি?—আজি সে বাটী এই প্রাসাদ-পরিপূর্ণ বিশাল কলিকাতা নগরীর একপার্শ্বে নগণ্য,

ক্ষুদ্র, সাধারণের অপরিচিত। অহো! কালের কি বিচিত্র মহিমা! যে দত্তবংশ একদিন মানসম্ভ্রমে সমুন্নত ছিল, পার্থিব সমৃদ্ধির হিসাবে আজি তাহার স্থান কোথায়!

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় দত্তবংশ প্রকৃতই ধনে, মানে, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিষ্ঠায় সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল।

দুর্গাচরণ-পুত্র বিশ্বনাথ শৈশবেই এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহা দ্বারা বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে, পরিবারস্থ সকলেরই মনে এইরূপ আশার উদয় হইল।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথানুসারে দ্বাদশ বৎসর পরে দুর্গাচরণ একবার জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে স্বগৃহে গমন না করিয়া এক বন্ধু গৃহে উপস্থিত হন ও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যেন তাঁহার আগমন-বার্ত্তা তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচারিত না হয়। বন্ধু কিন্তু ঐ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া গোপনে দত্তবাটীতে সংবাদ দিয়াছিলেন। শ্রবণ মাত্র দত্ত পরিবারের সকলে বন্ধুর গৃহে আসিয়া এক প্রকার জোর করিয়া সন্ন্যাসীকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবামাত্র বালক বিশ্বনাথ সাধুদর্শন করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে না লইয়া শুধু হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। বহুদিনের পর তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলের আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তাঁহারা আর ছাড়িয়া দিবেন না স্থির করিয়া সন্ন্যাসীকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তাঁহাকে সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে একবার স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিয়াছে সে কি আর পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে চায়? সন্ন্যাসী

তিন দিবস চক্ষু নিমীলিত করিয়া জড়বৎ ঘরের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন দেখা গেল সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

এ বিশাল জগতে আবার একা! সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। স্ত্রী-পুত্রের কথা কি ক্ষণিকের জন্যও মনে উদিত হইয়াছিল?—কে বলিতে পারে? তিনি পুত্রমুখ দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে মুখ তাঁহার বৈরাগ্যদগ্ধ চিত্তপটে একটা ক্ষীণরেখাও আঁকিতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ। বরং মনে হয় তিনি আর তখন শিশুটীকে পুত্রজ্ঞান না করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে বিশ্বপিতার চরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন।

আর স্ত্রী?—সে পতিপ্রাণা স্বামি-বিরহিনীর দর্শন আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই! শুনিলেন এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

মায়াবন্ধন ঘুচাইবার জন্য পরমেশ চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে সন্ন্যাসী দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

এ জীবনে আর কেহ কখনও তাঁহার দর্শন পায় নাই।

পিতামাতার পরিচয়।

পুত্র বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত নানা ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থানুসরণ করতঃ আইনব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি হাইকোর্টে এটর্নীগিরি করিলেও শীঘ্রই এরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন যে মফঃস্বল হইতেও তাঁহার ডাক আসিত। তিনি প্রখর বুদ্ধি ও মেধা বলে ব্যবহারশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেও সবিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। (ইতিহাস পাঠে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং বিভিন্ন জাতির উন্নতি অবনতির কারণানুসন্ধানে তিনি সাতিশয় কৌতূহল বোধ করিতেন।) কিন্তু শুধু যে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান ও বহুদর্শিতা ছিল তাহা নহে। (তিনি অতিশয় ভোগপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁহার মত ছিল সংসারে থাকিতে হইলে বেশ ভালভাবেই থাকা উচিত। যদি সংসার করিতে চাও ত পুরাদস্তুরেই কর, প্রাণ ঢালিয়া কর, সব সাধ মিটাইয়া সব আকাঙ্ক্ষার শেষ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া ছাড়। আনো, ঢালো, খাও; যতদিন অর্থ আছে সুখে সচ্ছন্দে কাটাও; নিজে খাও পরকে খাওয়াও, রাজার হালে চল। তাঁহার চালচলন ও জীবনযাপন প্রণালীও ঠিক তাঁহার চিন্তা ও মতের অনুগামী ছিল। তিনি দীনহীনভাবে জীবনযাপন করিতে জানিতেন না। প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেন এবং ব্যয়ও করিতেন অকাতরে। তাঁহার বিস্তর বন্ধু ছিল এবং খুব কম লোকই তাঁহার ন্যায় সহজে আলাপ জমাইয়া লইতে পারিত। সরসপ্রাণ বিশ্বনাথ এই সকল বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে ও লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি নিজে

রন্ধনবিদ্যায় পটু ছিলেন। তাঁহার মত আদর যত্ন করিয়া নানাবিধ ভোজ্যবস্তু দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তিসাধন করিতে অল্পলোকেই পারিত। তিনি প্রত্যহ স্বচক্ষে রন্ধনশালা পরিদর্শন করিতেন এবং একটা না একটা অভিনব আয়োজনের অবতারণা করিতেন। অতিথি অভ্যাগতদিগকে ভোজন করাইবার উদ্দেশ্যে নূতন প্রকারের ত কিছু করাই চাই—তাও আবার স্বহস্তে।

তাঁহার আর একটী সখ ছিল—দেশ ভ্রমণ। আজি একস্থানে, কালি একস্থানে—কখন কোথায় যাইবেন কিছুমাত্র স্থির থাকিত না। হঠাৎ আসিয়া বলিতেন—চল অমুক স্থানে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানে কিছুকাল বাস করায় তিনি মুসলমান আচার ব্যবহারের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। নিত্য-পলান্নভোজনের প্রথা সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার পরিবারমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

মোটের উপর বিশ্বনাথবাবু একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবনটী কাব্যের ন্যায় মধুর ছিল।

কিন্তু তিনি যে শুধু সৌখীন বাবুটী ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার হৃদয় দয়ার আধার ছিল। পরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত ও পরোপকারার্থ তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি বহু আত্মীয়ের প্রতিপালক ও গরীবের মা বাপ ছিলেন এবং কেহ তাঁহার সাহায্য চাহিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তাঁহার বাটীতে অনেক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেন এবং কেহ কেহ আবার নেশাভাঙ্গও করিতেন। নরেন্দ্র বড় হইয়া ঐ সকল অযোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্য পিতার নিকট অনুযোগ করিলে তিনি বলিতেন "জীবনটা যে কত দুঃখের তা এখন কি বুঝ্‌বি? যখন বুঝ্‌তে পার্‌বি

তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে তাদের পর্য্যন্ত দয়ার চ'খে দেখ্‌বি।" তাঁহার মত ছিল জোর করিয়া লোককে সংশোধন করিতে যাওয়া অপেক্ষা যাহাতে সে নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আপন চরিত্র সংশোধন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। 'যতক্ষণ একটা ক্ষুদ্র বা নীচ বিষয়ে আসক্তি থাকে ততক্ষণ উচ্চবস্তুর ধারণা হয় না। কিন্তু সে আসক্তির মোহ যখন আপনিই কাটিয়া যাইবে, তখন প্রাণে উচ্চ চিন্তা বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে পারে।)

পরিবারবর্গের সুখবিধান ও আনন্দবর্দ্ধন করা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পুত্রদিগের জন্য বিশেষ জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র ভাবিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তাহারা সকলেই কালে মানুষ হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল ও ফার্সিকবি হাফেজের বয়েৎ সমূহের মধ্যে যেরূপ গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে আর কোথাও সেরূপ নাই। তিনি প্রত্যহ ঈশার পুণ্যচরিত ও হাফেজের কবিতাসকল পাঠ করিতেন এবং মাঝে মাঝে উহাদিগের কিছু কিছু স্ত্রী পুত্রদিগকেও শ্রবণ করাইতেন।

বিশ্বনাথ যে অবস্থায় থাকুন না কেন কখনও হৃদয়ের মহত্ত্ব হারান নাই। লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কাহাকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হয় এ সকল তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। সাধারণতঃ তাঁহার হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও ব্যবহার অতি মধুর ছিল, কিন্তু তাহাতে গাম্ভীর্য্যের অভাব ছিল না। তাঁহার শিক্ষাদানের প্রণালীও বড় সুন্দর ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিল 'আপনি আর আমার জন্য কি করিয়াছেন ?' তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ

দর্পণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন 'যা, আর্শিতে নিজের চেহারাটা একবার দেখ্‌গে, তাহ'লেই বুঝ্‌বি।' আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইল না। পুত্র পিতৃবাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন। আর এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ কোন একটী বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে তুই একটী কটু কথা বলিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজন্য তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্যবর্গের সহিত উঠা বসা করিতেন, তাহার দ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড কয়লা দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—'নরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্যবর্গ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্য্যন্ত নিজ অপরাধের জন্য যথেষ্ট লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

'সংসারে কিরূপভাবে চলা উচিত' এই সম্বন্ধে নরেন্দ্র একদিন পিতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন 'কখনও কোন বিষয়ে বিস্ময়প্রকাশ করিও না' (Never show surprise)। বোধ হয় এই উপদেশানুসারে চলাতেই তিনি পরে স্বদেশে বিদেশে রাজার প্রাসাদে ও ভিখারীর পর্ণকুটীরে সর্ব্বত্র সমভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ-পত্নী ভুবনেশ্বরীও সর্ব্বাংশে পতির অনুরূপা ভার্য্যা ছিলেন। পতির যেরূপ রাজতুল্য প্রকৃতি—পত্নীও তেমনি। যাঁহারা ভুবনেশ্বরী মাতাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার ন্যায় রমণীরত্ন এ জগতে দুর্লভ। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমতী, কার্য্যকুশলা, সুরূপা ও দেবভক্তিপরায়ণা ছিলেন এবং একাকী সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্য্য

অনায়াসে নির্ব্বাহ করিয়াও সূচীকর্ম্মাদি শিল্পাভ্যাসের জন্য সময় করিয়া লইতেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারত উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত স্বামী ও পুত্রগণের নিকট হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে শিখিয়া এরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার সহিত কথোপকথনকালে তাঁহাকে বেশ শিক্ষিতা বলিয়াই বুঝা যাইত। তাঁহার ধারণাশক্তিও অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি রাজরাণীর তুল্য গরীয়সী ও অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন—মিতভাষিণী, গম্ভীর প্রকৃতি,—অথচ ব্যবহারে অতি মিষ্ট। অন্য রমণীরা তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিতেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বা তাঁহার নিকটে থাকিতে পাইলে আপনাদিগকে ধন্যা মনে করিতেন।

ভগবান্ তাঁহাকে চারিটী কন্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটী অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত থাকায় তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তথাপি একটী পুত্র হইল না। ভুবনেশ্বরী সকাল সন্ধ্যায় ইষ্ট-আরাধনার সময়ে দেবতার নিকট একান্ত চিত্তে প্রাণের বেদনা জানাইতেন।

৺কাশীধামে তাঁহাদের এক বৃদ্ধা আত্মীয়া ছিলেন। ভুবনেশ্বরী তাঁহাকে পত্র লিখিলেন যেন তিনি বংশরক্ষার্থ একটী পুত্রের 'মানত' করিয়া প্রত্যহ বীরেশ্বর শিবের অর্চ্চনা করেন। তদনুসারে বৃদ্ধা ক্ষীণযষ্টিসাহায্যে প্রত্যহ ৺বীরেশ্বর-মন্দিরে গিয়া পূজা ও অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভুবনেশ্বরী মাতা যথাসময়ে এ সংবাদ পাইয়া অতিশয় হর্ষলাভ করিলেন।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, ভুবনেশ্বরীর মনে পুত্রপ্রাপ্তির আশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি দিবারাত্র শিবধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সহস্র সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও

শিবচিন্তায় বিরত থাকিতেন না। দেবাদিদেব কি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না? যিনি চিরদিন ভক্তের অভীষ্টফলদাতা, তিনি কি এ প্রার্থনা উপেক্ষা করিবেন? ভুবনেশ্বরী প্রত্যহ শিবপূজা, শিবমূর্ত্তি ধ্যান ও শিবনামজপে তন্ময় হইয়া উঠিলেন। গৃহের সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—তাঁহার মুখের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, দেহ হইতে কি অপার্থিব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে।

এই ভাবে বহুদিন অতীত হইল। একদিন ভুবনেশ্বরী মহাদেবের যোগীশ্বরমূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। সমস্ত দিন ঠাকুরঘরে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেই দিন রজনীযোগে ভুবনেশ্বরী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। নিশ্চয়ই কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরের নিবেদন প্রভুর পাদপদ্মে পঁহুছিয়াছে, করুণানিলয় দেবাদিদেব তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, নতুবা এরূপ স্বপ্নের অর্থ কি? ভুবনেশ্বরী দেখিলেন যেন যোগীন্দ্র শঙ্কর যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! সেই রজতগিরিসন্নিভ বরবপু নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন 'শিব! শিব! শিব! এ কি স্বপ্ন না বিরাট্ সত্যজ্যোতিঃসাগরের একটা তরঙ্গ?' কে বলিবে বিশ্বেশ্বর কখন কি ভাবে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করেন!

স্বামীজির জন্ম ও বাল্যকথা।

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নদর্শনের কয়েকমাস পরে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী কৃষ্ণাসপ্তমীতিথিতে কলিকাতা নগরীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। সে দিন পৌষ-সংক্রান্তি—মকরবাহিনী পূজার দিন, সুতরাং বাঙ্গালা দেশে ভারী ধূমধাম।

নব প্রসূত শিশুর সহিত তদীয় পিতামহ দুর্গাচরণের অবয়বগত সাদৃশ্য দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সকলেই মনে করিলেন বুঝি দুর্গাচরণই দেহত্যাগান্তে পুনরায় এই কলেবরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক নামকরণের সময় কেহ কেহ বলিলেন ছেলের নাম হউক 'দুর্গাদাস'। কিন্তু ভুবনেশ্বরী শিশুর নেত্রমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—নাম? উহার নাম 'বীরেশ্বর'। এ নামে অবশ্য কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সেদিন হইতে শিশুকে 'বীরেশ্বর' বা 'বিলে' নামে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু 'বিলে' ত হইল ডাকনাম, ভাল নাম কি রাখা যায়? স্থির হইল—'নরেন্দ্রনাথ'।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথ তিন বৎসরে পড়িলেন। কিন্তু বালক বড় চঞ্চল। তাহার বিরুদ্ধে দিনরাত্রি নানাবিধ শান্তিভঙ্গের অভিযোগ শুনা যাইতে লাগিল। মাতা পুত্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, পুত্র বড় একরোখা। যা ধরিবে তা করিয়া ছাড়িবে, কিছুতেই তাহাকে বশ করা যায় না। তাহার দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির। বকুনি, ধমক, ভয়-প্রদর্শন—কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ

দেখিয়া মা বলিতেন 'অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটা ভূত'। ক্রোধ প্রশমনার্থ অনেক সময় তিনি পুত্রের মস্তকে হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া দিতেন ও ভয় দেখাইয়া বলিতেন 'যদি দুষ্টুমী করিস্ তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না'। বালক অমনি চীৎকার ক্রন্দন ছাড়িয়া চুপ করিত।

অনেকদিন পরে স্বামীজির শ্বেতকায় শিষ্যেরা বৃদ্ধা ভুবেনশ্বরীমাতার নিকট এই সকল গল্প শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন 'আচ্ছা, স্বামিজী তা হ'লে ছেলেবেলায় বড় দুরন্ত ছিলেন?' মাতা উত্তর করিয়াছিলেন 'কি বল গো! তাকে দেখ্বার জন্য দুটো ঝী অষ্টপ্রহর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্তো।' তিনি গল্প করিতেন 'ছেলেবেলা থেকে নরেনের একটা মহৎ দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কখনও রাগ হ'ত তা হ'লে আর জ্ঞান থাক্ত না, বাড়ীর আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরে তচ্‌নচ্ কর্‌ত।'

বাটীতে সাধু সন্ন্যাসী আসিলে স্বামীজি অমনি দেখিতে ছুটিতেন। কোনরূপে তাঁহাকে তখন ধরিয়া রাখা যাইত না। সন্ন্যাসী কিছু চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থিত দ্রব্য আনিয়া দিতেন। ইহাতে অনেক সময় বড় মুস্কিল হইত। একবার তাঁহার নূতন কাপড় হইয়াছে, সেখানি পরিয়া তিনি সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের সহিত খুব আড়ম্বর করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে "নারায়ণ হরি!" "নারায়ণ হরি!" বলিতে বলিতে এক সন্ন্যাসী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী আনন্দে তাঁহার পানে ছুটিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী একখানি ধুতি চাহিলেন। বালক অম্লানবদনে নিজ পরণের ধুতি খুলিয়া তাঁহাকে দিল। কিন্তু সে ছোট কাপড়, আধখানা কোমরে জড়াইতে কুলায় না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া তাহা পাগড়ী আকারে মাথায় পরিলেন ও বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সে সময়ে দত্তবাটীতে প্রায়ই পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। বিশ্বনাথ বাবু সন্ন্যাসী ফকিরের প্রতি বড় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং পরম যত্নে তাঁহাদের সৎকার করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতে সন্ন্যাসী আসিলেই বালক নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসীর প্রস্থানকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘরে চাবী বন্ধ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু বালক তাহা বড় গ্রাহ্য করিত না, যেই দেখিতেন নিকটে আর কেহ নাই, অমনি সম্মুখে যাহা থাকিত, তাহা জানালা গলাইয়া সন্ন্যাসীর নিকট ছুঁড়িয়া ফেলিতো। পরিবারস্থ সকলকে এইরূপে জব্দ করিতে পারিলে বালক আনন্দে আটখানা হইয়া নৃত্য করিত।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের সহিত নরেন্দ্রের মোটেই বনিত না। তিনি যখন তখন তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেন এবং তাঁহারা তাড়া করিলে ছুটিয়া পলাইয়া নর্দ্দামা বা আঁস্তাকুড়ে গিয়া দাঁড়াইতেন ও সেখান হইতে মনের সাধে নানাপ্রকার মুখবিকৃতি করিতেন। আর সে মুখের ভঙ্গিমাই বা কি! আঁস্তাকুড়ে কেহ তাঁহাকে ছুঁইতে পারিত না, কিন্তু তিনি শুচি অশুচি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেন, আর মুখ ভেংচাইতে ভেংচাইতে বলিতেন 'ধর্ না ধর্ না।'

তিনি জন্তু জানোয়ার লইয়া খেলা করিতে বড় ভাল বাসিতেন। বানর, ছাগল, ময়ূর, কাকাতুয়া, পায়রা ও কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর— ইহারাই তাঁহার খেলার সাথী ছিল, ইহা ছাড়া তাঁহাদের বাটীর গাভীও তাঁহার একটী পরম প্রিয়বস্তু ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার গলায় ফুলের মালা ও কপালে সিঁদুর লাগাইতেন ও গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার সহিত নানাবিধ মিষ্টালাপ করিতেন।

শৈশবে তাঁহার একটী প্রধান বিস্ময়ের বিষয় ছিল—কলিকাতা সহরের অসংখ্য গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ। গাড়ীর শব্দ শুনিলেই তিনি লুকাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যাইতেন, আর অবাক হইয়া শকটশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। গাড়ীওয়ালা গাড়োয়ান তাঁহার চক্ষে একটা উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া বোধ হইত। তাহারা কি সোজা লোক! তাহাদিগকে কাহার না প্রয়োজন? তাঁহার মনে হইত 'হায়, যদি আমি অমনি করিয়া কোচবাক্সে বসিয়া অশ্বযুগলের ত্রাসোৎপাদক চাবুক সপাৎ সপাৎ করিতে করিতে সহরের সমস্ত অজ্ঞাত প্রদেশে ঘুরিয়া আসিতে পারিতাম!'

একদিন গাড়ী করিয়া পিতামাতার সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন ও মা'র ক্রোড়ে বসিয়া পিতাকে অসংখ্য সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময়ে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিলে, তুই বড় হ'য়ে কি হবি বল্ দেখি?' বালক ঝটিতি উত্তর করিল 'সহিস কিংবা কচুয়ান!' সহিস বা কচুয়ান পদবী লাভ করাই যে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা এ বিষয় বালকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই উচ্চধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি সদাসর্ব্বদা আস্তাবলে গিয়া দেখিতেন কে কি করিতেছে। সেইটাই তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। দিনরাত সেইখানেই থাকিতেন, আর ঘোড়াগুলিকে খুব ভাল বাসিতেন।

ছেলেবেলায় রামায়ণের কথা শুনিয়া রামসীতার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। একদিন গুটীকতক পয়সা যোগাড় করিয়া পাড়ার একটী ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত বাজার হইতে একজোড়া মাটীর রামসীতা মূর্ত্তি আনিয়া নিজেদের বাটীর দোতলার ছাদের চিলের ঘরে খিল দিয়া দু'জনে ঠাকুর পূজায় লাগিয়া গেলেন। ঠাকুরের সুমুখে উভয়ে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন, এদিকে অনেকক্ষণ 'বিলেকে'

দেখিতে না পাইয়া বাড়ীর সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। মহা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ শব্দ। কোথাও বালকের সন্ধান নাই। এমন সময় কাহার মনে হইল ছাদের উপরটা একবার দেখা যাউক। ছাদে উঠিয়াই দেখেন সিড়ির ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া দ্বার খোলা না পাওয়াতে অবশেষে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ব্রাহ্মণবালকটী বেগতিক দেখিয়া ভগ্নদ্বার পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল, স্বামীজি কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থির, নিশ্চল, মুদ্রিতচক্ষু! অবশেষে প্রহারের চোটে সেদিন তাঁহার চৈতন্য হয়।

ইহার দিনকতক পরে আর এক মজা হইল। স্বামীজি ত প্রায় আস্তাবলে থাকিতেন। সহিসের সহিত তাঁহার ভারী বন্ধুত্ব, কারণ সে একজন 'সবজান্তা' লোক। যখনি কোন গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রণা করিবার আবশ্যক হইত তিনি সহিসের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদিন রামসীতার পূজার পর তিনি আস্তাবলে গিয়াছেন, কথায় কথায় সহিস গম্ভীর ভাবে বলিল 'বিবাহ করা বড় খারাপ।' ঐ ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণবশতঃ দাম্পত্য জীবনের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। আপন অভিজ্ঞতাবলে সে বুঝিয়াছিল যে বিবাহ করিলেই সংসারে রাগারাগি, ঝগড়া প্রভৃতি নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়, পোষ্যের সংখ্যা বাড়ে, পুত্র কন্যা প্রতিপালন করিতে হয় এবং আরও নানা অসুবিধা ঘটে। এক কথায় বিবাহ হইলেই যে মানুষের সুখ স্বাধীনতা সব ঘুচিয়া যায় এইটী সে বিশদভাবে স্বামীজির মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইল, স্বামীজিও তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নিজে কখনও বিবাহ করিবেন না; কিন্তু আর এক মুস্কিল উপস্থিত হইল। যে রাম-সীতাকে তিনি এত ভক্তি করেন তাঁহারা যে বিবাহিত! মা'র কাছে

শুনিয়াছিলেন, সীতারামের প্রেমের তুলনা নাই। সে প্রেম স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত—অপার আনন্দময়। এখন সহিস যে উল্টা বলে! যে বিবাহ করে তাহার সুখ নাই! তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সাশ্রুনয়নে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। এক কথায় তাঁহার বাল্যস্বপ্ন যেন চূর্ণ হইতে বসিল! তিনিঃ সীতারামের জন্য আন্তরিক দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। পুত্রের চক্ষে জল দেখিয়া মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বালক প্রথমে চুপ করিয়া রহিল—তারপর ফোঁপাইতে লাগিল। মা পুত্রকে কোলে লইলেন। বালক তখন একান্তে মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া তাহার মনের দুঃখ খুলিয়া বলিল। মা সব শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন 'বিলে, ওতে আর কি হয়েছে? তুই শিবপূজা কর্।'

সন্ধ্যার অন্ধকারে বালক একাকী ছাদের ঘরে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রামসীতার মূর্ত্তিপানে চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহা শতখণ্ডে চূর্ণ করিয়া পার্শ্বস্থ রাস্তায় ফেলিয়া দিল।

পরদিন বাজার হইতে একটী শিবমূর্ত্তি আনিয়া রামসীতার আসনে বসাইল এবং আবার তাহার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানাভ্যাসে রত হইল।

সন্ন্যাসী হইবার সাধ তাঁহার শৈশব হইতেই ছিল। বালক এক টুকরা গেরুয়া কাপড় কৌপীনের মত কোমরে আঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। মা বলিলেন 'এ কিরে?' বালক উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল 'আমি শিব হইয়াছি।' প্রাচীনেরা রহস্যচ্ছলে বলিতেন ধ্যান করিলে মাথায় মুনি ঋষিদের মত দীর্ঘ জটা বাহির হয় ও তাহা বটের শিকড়ের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত মাটির ভিতরে চলিয়া যায়। সরল বালক

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিয়া যাইত ও মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া দেখিত মাথা হইতে জটা নামিয়া ভূতলে প্রবৃষ্ট হইয়াছে কি না। যখন দেখিত কিছুই হয় নাই—তখন ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিত 'কৈ ধ্যান ত করিলাম, জটা কোথায় হইল ?' মা বলিতেন 'বাছা, এক আধ ঘণ্টায় কি এক আধ দিনে হয় না, অনেক দিন লাগে।'

এইরূপে বাটীর লোকেরা প্রায়ই দেখিতেন 'বিলে' কখন একাকী কখন বা প্রতিবেশী বালকগণের সহিত একত্রে ধ্যানে বসিয়া আছে। বালক কি ভাবিত কে জানে! কিন্তু সময় সময় আপনভাবে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইত যে সহজে তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইত না।

একদিন এইরূপে ধ্যান চলিতেছে, সহসা একজন বালক দেখিল মেঝের উপর এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ। সে ভীত হইয়া 'সাপ' 'সাপ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বামিজী ব্যতীত সকল বালকই ত্রস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে পলায়ন করিল। স্বামিজী কিন্তু ধ্যাননিমগ্ন—সংজ্ঞাশূন্য। সাথীরা ডাকাডাকি করিতে লাগিল তথাপি উত্তর নাই। তাহারা দেখিল মহা বিপদ। তাড়াতাড়ি তাঁহার পিতামাতাকে সংবাদ দিল। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন—ভয়ানক দৃশ্য! বালক চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে, ঊর্দ্ধে আকাশে ক্ষীণচন্দ্র শোভা পাইতেছে—নিম্নে পৃথিবীর উপর অস্পষ্ট অন্ধকার। পাছে শব্দ করিলে সাপ কোন অনিষ্ট করে, এই ভয়ে তাঁহারা চীৎকার করিতে সাহস করিলেন না। হঠাৎ সাপটী আপনিই সরিয়া গেল। এক মিনিট পরে আর তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্ষণকাল পরে স্বামিজীর বাহজ্ঞান হইলে সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু বলিলেন 'আমি ত কিছুই টের পাইনি।'

প্রসঙ্গক্রমে ইহার কিছু পরবর্ত্তী সময়ের একটী অদ্ভুত ঘটনার

উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটী তিনি নিজে এইভাবে বলিয়াছিলেন—'পাঠদ্দশায় একদিন রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যানে বসিয়াছি, ধ্যান শেষ হইয়া গেল—তথাপি চুপ করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করিয়া এক দেবতুল্য প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার একহস্তে দণ্ড, অপর হস্তে কমণ্ডলু এবং মস্তক মুণ্ডিত। মুখে অনির্ব্বচনীয় শান্তিচিহ্ন বিরাজিত। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ্ কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—যেন কি বলিবেন এইরূপ ভাব। আমিও প্রথমে অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম—কিন্তু তারপর কেমন ভয় হইল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলাম। পরে কিন্তু মনে হইল, কেন নির্ব্বোধের মত ভয়ে পলায়ন করিলাম, হয়ত তিনি কিছু বলিতেন।' যাহা হউক, তিনি আর কখনও সে মূর্ত্তির দর্শন পান নাই, বা তাঁহার সম্বন্ধে ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই, তবে বলিতেন—'সে মূর্ত্তি খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের।'

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার নিদ্রা! তিনি অন্যান্য বালকের ন্যায় বিছানায় শুইবামাত্র নিদ্রিত হইতেন না। তাঁহার অভ্যাস ছিল উপুড় হইয়া শয়ন করা। ঐ অবস্থায় নিদ্রিত হইবেন বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রূমধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্বিন্দুদর্শন হইত। ঐ অপূর্ব্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত। তারপর হঠাৎ উহা তারাবাজীর ন্যায় ফাটিয়া যাইত ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে আলো হইয়া যাইত। সেই আলোকসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রত্যহ রাত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিত। ব্যাপারটী বেশ আশ্চর্য্যজনক—কিন্তু তিনি ভাবিতেন বুঝি সকলেরই ঐরূপ হয়।

সেইজন্য কখন কাহাকেও ঐ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বহুদিন পরে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ধ্যান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তখন কাহার কেমন ধ্যান হইতেছে জানিতে গিয়া এক সমবয়স্ক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা ভাই, তুমি কি ঘুমাইবার আগে একটা জ্যোতিঃ দেখ?' বালক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া থাকিল! কিন্তু আজীবন স্বামীজি নিদ্রার পূর্ব্বে এইরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। তবে শেষ সময়ে আর এত ঘন ঘন ও এত বেশী স্পষ্ট হইত না।

পরমহংসদেব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'এটা ধ্যান-সিদ্ধের লক্ষণ।'

বহুবর্ষ পরে তাঁহার এক গুরুভ্রাতা তাঁহাকে এই জ্যোতিঃ দর্শন করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি আজও বলিয়া থাকেন যে, স্বামীজি যেই তাঁহার কপালে হাত দিলেন অমনি বহির্জগৎ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার স্থলে তিনি শুধু এক অখণ্ড জ্যোতিঃ-সমুদ্র দেখিতে লাগিলেন।

এই জ্যোতিঃদর্শন গভীর ধ্যানের ফল। স্বামীজির শৈশবাবস্থা হইতেই জ্যোতিঃ দর্শন হইতে শুনিলে স্বতঃই মনে হয় যে পূর্ব্বজন্মে তিনি অনেক ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য এ জন্মে ধ্যানটা যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

শিক্ষারম্ভ

ছয় বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ একখানি কোরা ধুতি পরিয়া কোমরে খাঁকের কলম ঝুলাইয়া মাদুর বগলে পাঠশালায় গেলেন। প্রথম যেদিন পাঠশালায় যান সেদিন সকালে বাটীর পুরোহিত আসিয়া মাটিতে রামখড়ির আঁখর কাটিয়া তাঁহাকে শিখাইলেন এটা 'ক' এটা 'খ'। নরেন্দ্রও বলিলেন এটা 'ক'—এটা 'খ'। কিন্তু দুই চার দিনের মধ্যেই এমন গুটিকতক অভিধান-বহির্ভূত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন যে পিতামাতা আর তাঁহাকে ওরূপ শিক্ষালয়ে যাইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। পাঠশালা ছাড়াইয়া এক গুরুমহাশয়ের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার সমর্পিত হইল। পাঠশালাটি কিন্তু নরেন্দ্রের বড় ভাল লাগিয়াছিল। অনেকগুলি সঙ্গী জুটিয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে বসিয়া ভুষোর কালীতে তালপাতার উপর বিচিত্র রকমের লিখিবার ছাঁদ অভ্যাস করিতে বেশ আমোদ বোধ হইতেছিল। হঠাৎ এ সব ছাড়িয়া বাড়ীর গুরুমহাশয়ের শাসনটা প্রথম তাঁহার বরদাস্ত হইল না। কিন্তু তাঁহার পিতা কতকগুলি আত্মীয় বালককে তাঁহার পড়ার সঙ্গী করিয়া দিলেন। বাড়ীতেই একটা ছোট-খাট পাঠশালার মত হইল।

চিরদিন তিনি মিষ্টকথার বশ ছিলেন। কড়া কথা মোটে সহ্য করিতে পারিতেন না। বাল্যেও এ স্বভাব ছিল। গুরুমহাশয় চোখ রাঙাইয়া বা মারিয়া ধরিয়া তাঁহার নিকট পড়া আদায় করিতে পারিতেন না। যা কিছু করিতেন গায়ে হাত বুলাইয়া।

পোড়োদের মধ্যে তিনি শীঘ্রই দলপতির আসন অধিকার করিলেন,

খেলাধূলাতেও সকলের' অগ্রণী। পর্ব্ব-উৎসবাদি হইলে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া সমস্ত দিনরাত উৎসবের আমোদে মাতিয়া থাকিতেন। এক-বার মকর-সংক্রান্তির দিন সুর ধরিলেন সাথিদের লইয়া দল বাঁধিয়া গঙ্গায় যাইতে ও গঙ্গাপূজা করিতে হইবে। পিতার অনুমতি পাইলেন এবং খরচও মঞ্জুর হইল। তিনি সঙ্গী বালকদলকে লইয়া বাটী হইতে নিশান উড়াইয়া ফুলের মালা দুলাইয়া গঙ্গার দিকে চলিলেন, যেন একটা ছোটখাটো শোভা-যাত্রা হইল। সারাপথ গাহিতে গাহিতে চলিলেন 'জয় জয় সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে'। পরে গঙ্গায় পৌঁছিয়া ফুল ও ফুলের মালাগুলি ভক্তিভরে সলিলস্রোতে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ধ্যায় আবাব সকলে একত্র হইয়া কলাব খোলাব ছোট ছোট নৌকায় দীপ জ্বালাইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দিলেন; সে কি সুন্দর দৃশ্য! এরূপ শত শত বালকদল সেদিন দীপালোকে গঙ্গাগর্ভ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

শুনা যায়, নরেন্দ্রনাথের পড়া তৈয়াবী করিবার রীতি একটু নূতন ধরণের ছিল। গুরু মহাশয় প্রত্যেক দিনের পাঠ নিজে পড়িয়া যাইতেন—তখন নরেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া শুইয়া থাকিত—তাহাতেই ঐ পাঠ আয়ত্ত হইয়া যাইত। রাত্রিতে নরেন্দ্র এক প্রবীণ আত্মীয়ের ([illegible] রামদত্তের পিতা) নিকট শয়ন করিতেন। এই ব্যক্তির কিঞ্চিত সংস্কৃত জানা ছিল এবং ইঁহার বিশ্বাস ছিল কঠিন কঠিন বিষয়গুলি বাল্যকাল হইতেই মুখস্থ করাইলে বালকদিগের শিক্ষা খুব অগ্রসর হয়। এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রতি রাত্রিতে নরেন্দ্রকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে নরেন্দ্র বৎসরাবধি কালের মধ্যে উক্ত পুস্তকের অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় সাত বর্ষ মাত্র।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে নেতৃত্বের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল।

সমবয়স্কদিগের সহিত খেলায় তিনি 'রাজা' সাজিতেন। ছুটিতে ছুটিতে পূজার দালানের সর্ব্বোচ্চ সোপানে গিয়া বসিতেন। নীচের সিঁড়ির দিকে দেখাইয়া আর দু'জন সঙ্গীকে বলিতেন 'তুমি হচ্ছো রাজমন্ত্রী, আর তুমি সেনাপতি। যাও ওখানে দাঁড়াও।' তাহার নীচের সিঁড়িতে সভাসদ্‌গণের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তারপর দরবার আরম্ভ হইত। কর্ম্মচারীরা একে একে ভূম্যবলুণ্ঠিতশিরে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন 'মন্ত্রি! রাজ্যের সংবাদ কি? প্রজারা বেশ সুখে আছে ত?' মন্ত্রী মহাশয় কখনও বলিতেন 'আজ্ঞা হাঁ, প্রজারা পরম সুখে আছে,' কখনও বা বলিতেন 'না মহারাজ, একজন দস্যু বড় উৎপাত করিতেছে'; তখন সেই অপরাধী দস্যুকে বিচারার্থ সভামধ্যে আনা হইত। যথারীতি বিচারান্তে সম্রাট্ আদেশ করিতেন 'রক্ষিগণ! শীঘ্র দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর।' অমনি রক্ষি বেশধারী দশ বার জন বালক সেই অপরাধী দস্যুকে বধ্যভূমে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইত, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ না করিয়া তীরবেগে দত্তবাড়ীর সদর দরজার দিকে ছুটিত। ক্রুদ্ধ রক্ষিদলও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইত। দুপুর বেলা, বাড়ীর সকলেই ঘুমাইতেছে। দেউড়ির ভৃত্যেরাও নিদ্রিত। তাহাদের নিদ্রাচ্ছন্ন দেহের উপর দিয়া সশব্দে পলাতক অপরাধী ও রক্ষীর দল দৌড়াইত। তাহারাও চমকিত হইয়া উঠিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 'দুর্বৃত্ত বালকদের' শাস্তি বিধানের জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইত, কিন্তু বালকদিগের সহিত দৌড়ে না পারিয়া শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিত। বালক নরেন্দ্র স্বস্থানে বসিয়া কৌতুক দেখিতেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেন; বোধ হয় ভাবিতেন—তাহারা তাঁহার কি করিবে? তিনি হচ্ছেন সম্রাট—দিন দুনিয়ার মালিক!

ইহা ছাড়া তিনি আরও এমন অনেক খেলা খেলিতেন যাহাতে একটু মাথা ঘামাইতে হয়। তখন কলিকাতায় সবে গ্যাসের আলো ও সোডা-লেমনেডের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনিও অমনি খেলা ঘরে গ্যাসের কারখানা ও সোডা-লেমনেড তৈয়ারী আরম্ভ করিলেন এবং নানা কল-কব্জা যোগাড় করিয়া খেলা ঘরে রেলগাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বলেন—"কতকগুলো পুরোণো দস্তার নল, মেটে হাঁড়ী ও খড় লইয়া বাহির বাটীর উঠানে তিনি তাঁর গ্যাসঘর তৈরী কর্‌লেন। খড়গুলি জ্বালাইলেই ধোঁয়া হইত ও যখন তাহা নল দিয়া বাহির হইয়া উপরে উঠিত তখন বাল-বুদ্ধিবশতঃ তিনি ভাবিতেন যেন সারা কলি-কাতা সহরের আলো ঐ গ্যাসে জ্বলিতেছে। সেই গ্যাসের কারখানায় যখন তিনি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে সেই ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া থাকিতেন তখন এক মজার দৃশ্য হইত। যেন কত বড় একজন ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছেন! কখনও কখনও আবার নাক-সিঁটকাইয়া (ওটা বংশের ধরণ) বলিতেন—"নাঃ, এ কিচ্ছু হয়নি।" সঙ্গীদের বলিতেন "আরও আগুণ দে, খুব ফুঁ লাগা, গ্যাস বড় কম বেরুচ্ছে।"

সে সময়ে বিশ্বনাথ দত্তের নিকট নানাজাতীয় মক্কেল আসিতেন। তাহার মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন। এ ব্যক্তি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই সমুদয় বালিশগুলি উপরে উপরে সাজাইয়া তাহার উপর সটান শয়ান হইয়া হেলিয়া পড়িতেন এবং অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে হুঁকা টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে 'ইয়া আল্লা,' 'খোদা তুমিই সত্য' প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিতেন ও যখন তামাকু সেবন করিতে ক্লান্তি বোধ হইত তখন সশব্দে একটি সুদীর্ঘ হাই তুলিতেন এবং কখনও কখনও বা সেই সুরে 'লা-এলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলোল্লাহে' বলিয়া উচ্চশব্দ করিয়া

উঠিতেন। অন্যান্য মক্কেলগণ তাঁহার ঐ প্রকার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া যেন দমিয়া যাইতেন ও হঠাৎ কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া নীরবে স্ব স্ব হুঁকায় গভীর মনযোগ দিতেন। তাহার ফলে সেই বিস্তীর্ণ বৈঠকখানা গৃহটি কুণ্ডলায় মান ধূমপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

এই মুসলমান মক্কেলটী কিন্তু নরেন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রও তাহাকে দেখিবামাত্র 'চাচা' বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন এবং তাঁহার পলাণ্ডুসুবাসিত মুখ হইতে পঞ্জাব আফগানিস্থানাদি দুর্গম দেশে উষ্ট্র, অশ্বগজাদি সাহায্যে বাণিজ্য যাত্রার সুদীর্ঘ কাহিনীসমূহ উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। সে গল্পের আদি অন্ত ছিল না। কিন্তু শৈশবোচিত কৌতূহলবশতঃ তিনি সেই সব গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ অনর্গল বলিয়া যাইতেন—তিনিও বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সেই সব লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন। মুসলমানটী আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে মিঠাই সন্দেশ ইত্যাদি খাইতে দিতেন। তিনিও দ্বিধাশূন্য চিত্তে সেগুলি ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু অপর মক্কেলগণ (ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলেও সকলেই হিন্দু) ইহাতে শিহরিয়া উঠিতেন। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দু হইয়া মুসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য ভোজন! এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঘন ঘন ধূম উদ্গীরণ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রষ্টাচার বালকের ভবিষ্যৎ দুর্গতি স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি ভ্রুকুটীপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িতেন না। বিশ্বনাথ বাবু যখন গৃহে প্রবেশ করিয়া এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেন তখন ব্যাপারটী বুঝিতে তাঁহার বাকী থাকিত না। কিন্তু তিনি নিজে আহারাদি বিষয়ে আচার পালন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলেন, সুতরাং পুত্রের এবম্বিধ আচরণে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতেন।

একদিন বড় মজা হইয়াছিল। বিষয়কর্ম্মের কথা উত্থাপিত

হইবামাত্র নরেন্দ্র সেস্থান ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে গেলেন। তাঁহার পিতা মক্কেলদিগের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তাহাদিগের সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন সেই অবসরে নরেন্দ্র কোথা হইতে ধাঁ করিয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন ও সারি সারি যত হুঁকা ছিল তাহার প্রত্যেকটীতে মুখ দিয়া এক একবার ভুড়ুক করিয়া টানিলেন। মুসলমানের হুঁকাটী একটু বেশী আগ্রহের সহিতই টানিলেন, কারণ উহাতে ক বড় 'খোসবয়' বাহির হইতেছিল।

এরূপ করিবার একটা কারণ ছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। জাতিভেদ জিনিষটা বালক নরেন্দ্রের নিকট বড় দুর্বোধ্য বোধ হইত। একজন আর একজনের সহিত খাইবে না কেন? ভিন্ন জাতি হইলেই বা দোষ কি? যদি জাতিভেদ না মানা যায় ত কি হয়? আকাশটা কি মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে না মানুষ মরিয়া যায়? বালবুদ্ধি বশতঃ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দ্রুতগতি সকল মক্কেলের হুঁকা হইতে ধূম উদ্গীরণ করিলেন। কিন্তু কই, তিনি ত মরিয়া গেলেন না, বা পৃথিবীটা তো ভাঙ্গিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িল না। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন সব জিনিষ আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। এমন সময় বিশ্বনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি কচ্ছিস্ রে?' পুত্র অম্লানবদনে উত্তর দিলেন 'দেখ্ছি জাত না মান্‌লে কি হয়!' পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং 'বটে রে দুষ্টু!' বলিয়া ধীরে ধীরে নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন।

আর একদিন যখন উপরোক্ত মুসলমানটি অন্যান্য মক্কেলের সহিত সম্রাট আকবরের গুণগ্রাম পর্য্যালোচনায় গভীর ভাবে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে সহসা বিশ্বনাথ দত্তের বাটীতে এক মহা হুলস্থুল ব্যাপার সংঘটিত

হইল। নরেন্দ্র অন্যান্য বালকের সহিত লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া দোতলার সিঁড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে আসিয়া পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া যান। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল, অনেক যত্ন ও চেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পরে বালকের চৈতন্য হইল। পিতামাতা উভয়েই অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার বলিলেন যে আঘাত গুরুতর বটে, কিন্তু জীবনের কোন ভয় নাই। শুধু কপালের কিয়দংশ কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে আজীবন স্বামীজির দক্ষিণ চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে একটা দাগ ছিল।

পরমহংসদেব বলিতেন 'যদি সেদিন ওই রকমে ওর শক্তি না ক'মে যেত, তাহ'লে ওযে পৃথিবীটা একেবারে ওলট-পালট ক'রে ফেল্‌তো!'

পূর্ব্বে বলিয়াছি অতি শৈশব হইতেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বয়ঃক্রমের তুলনায় তিনি যথেষ্ট বঙ্গালা বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি আবার সঙ্গীতেরও ভক্ত ছিলেন। সুতরাং যখন ভিখারী গায়কদল খোল বাজাইতে বাজাইতে গৃহদ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিত ও গান গাহিত তখন তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। একবার তাঁহাদের বাটির সন্নিকটে একস্থানে ঐরূপ একদল রামায়ণ-গায়ক পালা বিশেষ গাহিতে গাহিতে কয়েকটা পদ বিস্মৃত হইয়া অশুদ্ধভাবে গাহিতেছিল দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সে পদগুলি বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লাভ করিয়াছিলেন।

স্বামিজী যে বাল্যকালেই রামায়ণের শ্লোক ও পদের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শৈশবে তিনি যেখানেই রামায়ণগান হইত, শুনিতে যাইতেন,

কারণ সর্ব্বগুণাধার রামচন্দ্রকে তাঁহার আদর্শ পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। ভক্তশ্রেষ্ঠ অদ্ভুতকর্ম্মা হনুমানও তাঁহার অল্প শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। তিনি হনুমানের দর্শনলাভের জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলেন নাকি রাম-সেবককে তদ্গত চিত্তে ধ্যান করিলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। একবার এক কথক কথকতা করিতে করিতে বলিয়া ছিলেন যে, হনুমান কদলীবনে থাকেন। ব্যস্তভাবে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'সেখানে গেলে কি তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়?' কথক বালকের কৌতুকাবহ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন 'হ্যাঁগো, গিয়ে দেখ না।' সে রাত্রে গৃহে ফিরিবার সময় স্বামীজির মনে হইল যে বাটীর সন্নিকটেই কয়েকটা কদলীর ঝোপ আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বৃক্ষের তলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন এবং গভীর আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ হনুমানজীর দর্শন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল না তখন তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সকলে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন 'ওরে বিলে, বোধ হয় আজ হনুমান প্রভুর কাজে অন্য কোথাও গিয়াছেন, তাই তাঁর দেখা পাস্‌নি।' ইহাতে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে স্বামীজী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া সোৎসাহে মহাবীর হনুমানের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। মহাবীরের মহচ্চরিত্র তাঁহার হৃদয়ে এত দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, এমন কি বেলুড়মঠে তিনি তাঁহার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

শৈশবেই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সে সময়ের একজন দূরদর্শী প্রাচীন ব্যক্তি তাহার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন 'কালে এই ছেলে মস্ত লোক হবে।' ব্যাপারটা এইরূপঃ—

১৮৬৯ সালে তদানীন্তন দত্তবংশের কর্ত্তা নরেন্দ্রের পিতামহ স্থানীয় কালীপ্রসাদ দত্ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত; শেষ মুহূর্ত্ত আগতপ্রায় জানিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলকেই তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন এবং বালক বালিকাদিগের মধ্যে যে কেহ হউক তাঁহাকে একটু মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাক্ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ যখন কেহই একার্য্যে অগ্রসর হইল না, তখন ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নরেন্দ্র বৃদ্ধের অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে নিতান্ত অসম্মত হইয়া গম্ভীরভাবে সেই বৃহদাকার পুস্তকখানি দুইহস্তে উঠাইয়া ধরিলেন এবং ধীর স্থির পরিষ্কার উচ্চকণ্ঠে কয়েক পত্র পাঠ করিয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অতীন্দ্রিয় লোকের সান্নিধ্যে প্রসারিত-দৃষ্টি বৃদ্ধ এই কয়েকটি কথা বলিয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করিলেন "ভাই, কালে তুই নিশ্চয়ই মস্ত লোক হবি।"

বালকের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে চিত্র বৃদ্ধের চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল পাঠক দেখিবেন তাহা মিথ্যা হয় নাই।

বাল্যে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও বীজ তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। ছয় বৎসর বয়সের সময় একবার তিনি একজন সঙ্গীকে লইয়া চড়ক দেখিতে যান। চড়কতলা হইতে মাটির মহাদেব কিনিয়া উভয়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গীটি কতকদূর আসিয়া পিছাইয়া পড়িল। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। এমন সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিল। গাড়ীর শব্দে নরেন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিলেন যে সঙ্গের ছেলেটি একেবারে প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলায়! বাম হস্তের মধ্যে মহাদেবটি পুরিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সঙ্গীর জীবনরক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। পথের লোকেরা বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ঘটনাটি এত অল্প সময়ের মধ্যে

ঘটিয়াছিল যে কেহই বালকের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার সময় পায় নাই। যাহা হউক বালকটি সে যাত্রা আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল। দর্শকবৃন্দের অনেকেই নরেন্দ্রের সাধুবাদ করিলেন। কেহ কেহ তাঁহার পিঠ চাপড়াইলেন, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু তিনি গৃহে গিয়া মাতার নিকট ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে ভুবনেশ্বরী দেবী আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"বাছা, এই ত মানুষের মত কাজ। সব সময় এই রকম মানুষ হ'বার চেষ্টা কর্ব্বে।"

বিদ্যালয়ে।

সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নরেন্দ্র মেট্রপলিটান-স্কুলে ভর্ত্তি হন। প্রথমে ইংরাজীভাষা শিখিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বুলি ধরিলেন 'ও বিদেশী ভাষা, ও শিখিব কেন? তার চেয়ে আগে নিজের ভাষা ত শিখিলে ভাল হয়।' সকলে নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—কিছুতেই পরের ভাষা শেখা হইবে না। সকলে বলিল 'আজকাল ইংরাজী শিক্ষা করা দরকার, না শিখিলে চলে না ইত্যাদি।' কিন্তু তিনি অটল। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতাকে নরেন্দ্র বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া অনেক প্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মত পরিবর্ত্তনে সফলকাম হইলেন না। কিন্তু কয়েক মাস গত হইলে নরেন্দ্র কি জানি কি ভাবিয়া বৃদ্ধের কথানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দিন স্থির করিলেন ইংরাজী পড়িতে হইবে সেদিন হইতে এরূপ প্রগাঢ় আগ্রহের সহিত উহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেল। বিধাতার কি অদ্ভুত চক্র! যে ভাষায় উত্তরকালে তিনি সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যাহা না হইলে প্রতীচ্য জগতে হিন্দুধর্ম্ম এত শীঘ্র ও সহজে বিস্তারলাভ করিতে পারিত না, এক কথায় যে ভাষার সাহায্যে তিনি জগতে আপনার আগমনোদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষার প্রথম সোপানেই বিজাতীয় ভাষা বলিয়া তাহার উপর বিরাগ!

মাতার নিকটে তিনি প্রথম ইংরাজী বর্ণমালা ও ইংরাজী শব্দ শিক্ষা

করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের গল্পও শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। এই গল্প শ্রবণের ফলেই তিনি পরে একজন উত্তম গল্পকথক হইয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি ইজের পরিয়া স্কুলে যাইতেন এবং অস্থিরতা বশতঃ প্রত্যহই উহার কিয়দংশ ছিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইত। তিনি বাল্যকালে এত অস্থির ছিলেন যে, কখনও বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেন না। দাঁড়ান ও বসার মাঝামাঝি যত রকম উপায়ে শরীরকে রাখা যাইতে পারে তাহারই কোন না কোন একটা ভঙ্গীতে তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তিনি পূর্ণ মাত্রায় বালক ছিলেন। খেলিবার সময় খেলায় অত্যন্ত এত মত্ত হইতেন যে, সে সময়ে অন্য কোন বিষয় আর চিত্তে স্থান পাইত না। মার্ব্বল খেলা, ছুটাছুটি, হুটোপাটি, লাফান ও ঘুসোঘুসি এইগুলি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। এ সকল বিষয়ে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন এবং প্রত্যহ পরদিন কি কি খেলার 'প্রোগ্রাম' হইবে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। বালকদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই সকলে মধ্যস্থ মানিত। তিনি নিজে বিবাদ বিসংবাদ আদৌ পছন্দ করিতেন না, বিশেষতঃ যাহারা ক্রীড়ার নিত্যসঙ্গী তাহাদিগের মধ্যে মারামারি উপস্থিত হইলে বিশেষ বিরক্ত হইতেন। যদি কখনও ঐরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত তবে নিজে প্রতিপক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে ছুটিয়া গিয়া উভয়কে পৃথক্ করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে ঐরূপ করিতে যাইয়া নিজেকেও দু' এক ঘা প্রহার সহ্য করিতে হইত, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই সকলকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিতেন। তিনি নিজে শিষ্যদের বলিতেন, "ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিঠে ছিলুম,

তা' না হ'লে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আস্‌তে পারতুম রে!"

চলিত ভাষায় 'ডানপিটে' শব্দের যে অর্থই হউক, বাস্তবিক শৈশব হইতে তাঁহার চরিত্রে আত্মশক্তি-অনুভব জনিত প্রকৃত নির্ভীকতা ও তৎসহ ভাবী চঞ্চলতার আভাস প্রস্ফুরিত হইয়াছিল।

কিন্তু বালসুলভ চপলতা ব্যতীত আর একটি মহত্তর বৃত্তির অঙ্কুর এই সময়ে তাঁহাতে দেখা দিয়াছিল, সেটি হইতেছে 'দয়া'। তাঁহার জননী পুণ্যশীলা ভুবনেশ্বরী মাতা অতিশয় করুণহৃদয়া ছিলেন এবং স্বামিজী তাঁহার করুণকোমল হৃদয়খানি স্বীয় জননীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ভুবনেশ্বরী মাতার সহৃদয়তার পরিচয় এখানে দিব। স্বামিজীর পিতা একটি বন্ধকী সম্পত্তি সহধর্ম্মিণীর নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছিলেন। দৈন্যদশাগ্রস্ত এক মুসলমান পরিবার ঐ সম্পত্তি তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল, কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় অর্থ সংগ্রহ না হওয়াতে তাহারা অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইয়া কাতরভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত ভুবনেশ্বরী মাতার নিকট নিবেদন করিলে তাহাদের অনশনক্লিষ্ট মলিনবদনের ভয়-চকিত কাতর দৃষ্টি উচ্চান্তঃকরণা রমণীর হৃদয় স্পর্শ করিল এবং তিনি তাহাদের করুণ কাহিনী শ্রবণে বিগলিতচিত্ত হইয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধকী দলিলখানি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

স্বামীজিও এ বিষয়ে সর্ব্বাংশে জননীর অনুরূপ ছিলেন। সমবয়স্ক ক্রীড়া-সাথী সকলকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। অনেক সময়ে তাহাদিগের মধ্যে তিনি কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ইহা লইয়া ঘোরতর তর্ক হইত। প্রত্যেকেই ভাবিত যে তাহাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। ক্রীড়াকালে যদি কাহাকেও পীড়িত

বা আহত হইতে দেখিতেন তাহা হইলে তখনই ক্রীড়া বন্ধ রাখিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। একবার তিনি কুড়ি পঁচিশ জন বালককে সঙ্গে লইয়া গড়ের মাঠে কেল্লা দেখিতে যাত্রা করেন। তাহাদের মধ্যে একজন কিছু অসুস্থ বোধ করিতেছিল, কিন্তু বালকগণ সত্য সত্যই যে তাহার কোন পীড়া হইয়াছে তাহা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে লইয়া নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল। সে বালকটী কিন্তু ক্রমশঃই ক্ষীণশক্তি ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীজিও অন্যান্য বালকগণের ন্যায় কলহাস্থে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে সকলের অগ্রে অগ্রে যাইতে-ছিলেন, সহসা তাঁহার মনে হইল হয়ত পিছনের বালকটি সত্যই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে; অমনি তিনি ফিরিলেন। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়াই দেখিলেন বালকটি পথের ধারে বসিয়া পড়িয়াছে ও প্রবল জ্বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন তিনি ধরাধরি করিয়া তাহাকে একখানি গাড়ীতে চাপাইয়া স্বয়ং তাহার গৃহে তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। এই গুণেই বালকেরা এত সহজে তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিত।

এই সময়েই আর এক দিবস তিনি একটি বালক ও তাহার মাতাকে বিষম দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করেন। একখানি গাড়ী হঠাৎ তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়ায় তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু স্বামীজি ক্ষিপ্রগতিতে একহস্তে বালকটিকে ধরিয়া টানিলেন ও অপর হস্তে তাহার মাতাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে উভয়েই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

পরকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার সময় স্বামীজি কখনও নিজের বিপদ গ্রাহ্য করিতেন না।

সহপাঠীদিগকে তিনি যেমন প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন তাহারাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বাল্যজীবনের যাহাতে পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা তাহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। অশ্রান্ত চঞ্চলতা, ক্রীড়া, কৌতুক, রহস্য, হাস্য পরিহাস প্রভৃতি যে সকল কমনীয় ভাবে শৈশবজীবনের পরিপুষ্টি, তাহা তাঁহাতে সম্যক্ বিকশিত হইয়াছিল। ক্লাসের প্রত্যেক বালককে তিনি এক একটা উদ্ভট নামে সম্ভাষণ করিতেন। ঐ সকল উদ্ভট নাম কতকটা তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কপ্রসূত এবং কতকটা আবার বিবিধ উপকথা ও উপন্যাসাদি হইতে সংগৃহীত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি বাল্যকালে 'ডানপিটে' ছিলেন। এই ডানপিটে স্বভাব বা দুরন্তপণার জন্য বালকমহলের সকলেই তাঁহার অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিল। পড়াশুনার দিকে তাঁহার ঝোঁক সামান্যই ছিল। কারণ প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপন করিতে তাঁহার এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিত না। বাকী সময়টা তিনি কেবলই নব নব ক্রীড়া-কৌতুক উদ্ভাবনে রত থাকিতেন। জল-খাবারের পয়সা জমাইয়া হয় লজেঞ্জস, না হয় মার্ব্বেল অথবা নূতন ব্যাট কি বল্ কিনিতেন এবং খুব অল্প বয়সেই ক্রিকেট খেলায় পটু হইয়াছিলেন। বছরের নয় মাস এই ভাবে খেলিয়া-বেড়াইয়া বাৎসরিক পরীক্ষার ২৷৩ মাস পূর্ব্ব হইতে খুব পড়ায় মন দিতেন। এই সময়ে ইতিহাস, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত নারাজ ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পিতার অনুরূপ ছিলেন। অঙ্ক সম্বন্ধে তাঁহার পিতা বলিতেন

'ও ত মুদীর দোকানের বিদ্যে।' প্রথম কয়েক বর্ষ মেট্রপলিটানে অধ্যয়ন কালে তিনি অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন,—কিন্তু বালবুদ্ধিবশতঃ যে সকল খাদ্য এই পীড়ায় অনিষ্টকর সুবিধা পাইলেই তাহা খাইতেন।

ক্লাসে কোন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহার কোন পূর্ব্বপুরুষ, বিশেষ ঠাকুরদা, সন্ন্যাসী ছিলেন কি না। সন্ন্যাস জীবনের প্রতি অনুরক্তি বাল্যাবধি কখনও তাঁহার হৃদয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে এটি তাঁহার বরাবর মনে মনে ছিল, এবং শৈশবসুলভ আবেগ বশতঃ সঙ্গীদিগের নিকট বলিতেন 'বড় হইয়া আমি সন্ন্যাসী হইব, অমুক অমুক জায়গায় যাইব, অমুক অমুক করিব—ইত্যাদি।' কখন কখনও ছেলেরা একত্র হইয়া পরস্পরের হাত দেখিত। কিন্তু হাত দেখা কাজটি তাঁহারই প্রায় একচেটিয়া ছিল। নিজের হাত দেখিয়া তিনি বলিতেন 'আমি সাধু হইব, এতে আর কোন ভুল নাই দেখিস্, আমার হাতে সন্ন্যাসী হবার খুব বড় এক চিহ্ন আছে।' এই বলিয়া তিনি কতকগুলি কররেখা তাহাদিগকে দেখাইতেন। একজন বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ওগুলি নাকি সন্ন্যাসযোগের পরিচায়ক। নরেন সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া অন্যান্য সকলেই সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। তারপর কথা হইত যে বড় বড় সাধুরা কি করেন। কল্পনাবলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনে একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেন 'সন্ন্যাসী এই করে, এই করে।' কিন্তু নরেন্দ্র বলিতেন 'না না তোরা কিছু জানিস্‌নে, বড় বড় সাধুরা সব হিমালয়ের উপর থাকেন, সে সব জায়গায় মানুষে যেতে পারে না। তাঁদের সঙ্গে কৈলাস পর্ব্বতের উপর রোজ মহাদেবের দেখা হয়। তোরা যদি সন্ন্যাসী হ'তে

চ'াস তবে ঐ সব পাহাড়ে বা গহন জঙ্গলে গিয়ে ঐ রকম মহাত্মাদের পায়ে পড়্তে হবে। তারপর তাঁরা এক একটা লম্বা বাঁশের উপর শুতে দেন। যদি তার ওপর শুয়ে কেউ ঘুমুতে পারে তারপর গেরুয়া পরিয়ে চেলা ক'রে নেন।'

আহা শৈশবের কল্পনা কি সরল!

নরেন্দ্রের এক সহপাঠীর বাটীতে একটি চাঁপাফুলের গাছ ছিল। যখন আর কিছু ভাল লাগিত না তখন ঐ চাঁপাগাছের ডালে পা বাধাইয়া হাত ছাড়িয়া মাথা নীচু করিয়া ঝুল খাইতে নরেন্দ্র বড় ভালবাসিতেন। এমন কি দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও ঐরূপ করিতে ভাল লাগিত। চাঁপাফুল শিবের প্রিয়, নরেন্দ্রও চাঁপাফুল ভালবাসিতেন। একদিন তিনি উপরোক্ত প্রকারে দোল খাইতেছেন এমন সময় ঐ বাটীর কর্ত্তা—উক্ত সহপাঠীর বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা, নরেন্দ্রের গলা শুনিতে পাইয়া সেথায় উপস্থিত হইলেন। অতটুকু ছেলেকে ঐরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় গাছের উচ্চশাখা হইতে দোদুল্যমান দেখিয়া ও চাঁপাফুল গুলির শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধ ব্যস্ত-সমস্তভাবে বালককে গাছ হইতে নামিতে বলিলেন ও ভবিষ্যতে ঐ গাছে চড়িতে নিষেধ করিলেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন, ও গাছটায় চড়্লে কি হয়?' বৃদ্ধ বলিলেন 'ও গাছে একটা বেহ্মদত্যি আছে, তার ভয়ানক চেহারা, নিস্মুতি রাত্রে সে একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।' ঐ অদ্ভুত ভূতের কথা শুনিয়া নরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ভূতেরা কি করে, ঐরূপ বেড়াইয়া বেড়ান ছাড়া তাহাদের আর অন্য কাজ আছে কি না ইত্যাদি। এমন সময় বৃদ্ধটি বলিলেন 'আর যারা ঐ গাছে চড়ে সে তাদের ঘাড় মট্‌কাইয়া দেয়।' নরেন তখন কিছু বলিল না। কিঞ্চিৎ পরে বৃদ্ধ

ঔষধ ধরিয়াছে মনে করিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যেই বৃদ্ধ চলিয়া যাইলেন অমনি নরেন্দ্র পুনরায় বৃক্ষে আরোহণ করিলেন,—উদ্দেশ্য ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পাইলে তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী বলিল "না ভাই সাবধান, অমন কর্ম্ম করিস্‌নি, তা হ'লে সে তোর ঘাড়টা মট্‌কাবে।" তাহাকে সত্য সত্যই ভীত দেখিয়া নরেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "তুই ছোঁড়া কি আহাম্মোক! একজন একটা কথা ব'লে গেল ব'লেই কি সেটাকে বিশ্বাস কর্‌তে হবে? যদি তোর ঠাকুরদা বুড়োর ঐ বেহ্মদত্যির কথা সত্যি হত তা হ'লে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা মুচ্‌ড়ে খাওয়া উচিত ছিল।"

এটা অবশ্য একটা বালকের গল্প মাত্র। এখনও হয়ত অনেক বালকের সম্বন্ধে এরকম বা এর চেয়েও ভাল গল্প ঢের শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার উত্তরটি—'একজন ব'লচে ব'লেই কি বিশ্বাস ক'রতে হবে না কি?'—এই ভাবটা তাঁহার চিরদিন ছিল। তিনি বিনা বিচারে অন্ধের মত কোন জিনিষ বিশ্বাস করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শেষ জীবনে বলিতেন—

"বইএ লেখা আছে অতএব সত্য, এমন ভাবে কোন জিনিষকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। অমুক লোক বলিয়াছে অতএব সত্য, এই বলিয়া কোন জিনিষকে হঠাৎ সত্য বলিয়া মানিও না। সত্যটা যে প্রকৃত কি, তাহা নিজে জানিবার চেষ্টা কর।"

উপরোক্ত সহপাঠীর পিতা নরেন্দ্রকে বড় স্নেহ করিতেন এবং ভবিষ্যতে তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবেন এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। একদিন নরেন্দ্রকে উপরোক্ত লিখিত

বৃক্ষ হইতে দোল খাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন— 'তুমি ছোক্‌রা বুঝি সমস্তদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই রকম ক'রে খেলিয়ে বেড়াও! কখন পড়াশুনা কর কি?' নরেন্দ্র বলিলেন 'আজ্ঞে হাঁ, আমি দুই-ই করি—খেলি, আবার পড়িও।' তখন পরীক্ষা আরম্ভ হইল—ভূগোল, অঙ্ক, কবিতা-আবৃত্তি সব বিষয়ের পরীক্ষা হইল। নরেন্দ্র চট্‌পট্‌ সব জিনিষের উত্তর দিলেন। পরীক্ষক ভদ্রলোকটি অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন 'বটে? বেশ বেশ—আচ্ছা তোমায় দেখে কে? তোমার বাপ ত লাহোরে।' নরেন্দ্র উত্তর করিলেন 'হাঁ, বাবা লাহোরে আছেন বটে, কিন্তু মা ত এখানে আছেন। তিনিই আমায় যা যা ক'রতে হবে ব'লে দেন, আর আমি নিজেই পড়ি।' ভদ্রলোকটি প্রকাশ্যে আর অধিক কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন 'হাঁ, তুমি কালে নিশ্চয়ই উন্নতি ক'রবে। আমি প্রাণভরে তোমায় আশীর্ব্বাদ করুছি।' তাহার পর হইতে তিনি বরাবর নরেন্দ্রের খোঁজ খবর রাখিতেন ও বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার জীবনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন।

স্বামীজির যখন সাত আট বৎসর বয়স তখনকার একটি ঘটনায় তাঁহার সাহসের খুব পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐ সময়ে একদিন তিনি কয়েকজন সহপাঠীকে সঙ্গে লইয়া মেটেবুরুজে লক্ষ্ণৌএর ভূতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজিদ আলি সা'র পশুশালা দেখিবার জন্য চাঁদপাল ঘাট হইতে নৌকারোহন করেন। ফিরিবার সময় একজনের শরীর অসুস্থ হওয়ায় নৌকার মধ্যে বমি করিয়া ফেলে। ইহাতে মুসলমান মাঝি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উহা স্বহস্তে পরিষ্কার করিবার জন্য জেদ করিতে থাকে, কিন্তু বালকেরা অন্য কাহারও দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে বলে এবং তৎপরিবর্ত্তে

দ্বিগুণ ভাড়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। মাঝি তাহাতে অসম্মত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে উহা সাফ্ করিবার জন্য অনুযোগ করিতে থাকে এবং বালকেরা উহা অস্বীকার করায় তাহাদিগকে গালিগালাজ ও নানাবিধ কটূক্তি করিতে থাকে এবং অবশেষে ঘাটের কাছে আসিয়া উহা সাফ্ না করিলে নৌকা ঘাটে লাগাইবে না এইরূপ ভয় প্রদর্শন করে। তখন বচসা হইতে হইতে ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতির উপক্রম হইল এবং ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিল। বালকেরা মহা বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি ইত্যবসরে যেই নৌকাখানি একটু ঘুরিয়াছে অমনি মস্ত এক লাফ দিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন দূরে দুইজন শ্বেতকায় পুরুষ বায়ুসেবনার্থ ময়দানের দিকে চলিয়াছে। অমনি তিনি ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাদের নিকটে গিয়া ভাঙ্গা ইংরাজীতে আপনাদের অবস্থা জানাইলেন। ঐ দুই ব্যক্তি পলটনের গোরা, তখন তাহারা তত প্রকৃতিস্থ ছিল না, মদ্যপান করিয়া টলিতে টলিতে আসিতেছিল। কিন্তু নরেন্দ্রের সরল বিশ্বাস ও সাহস দর্শনে তাহারা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিল—'All right my boy, all right my boy, don't you worry.' নরেন্দ্র তাঁহার ক্ষুদ্র হস্তে তাহাদের একজনের হস্তধারণ করিয়া তাহার অসংযত পদবিক্ষেপ যথাপথে পরিচালনে সাহায্য করিয়া নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাঝিমাল্লা ও বালকেরা সকলেই অবাক্। একে সাহেব, তায় গোরা, তায় মাতাল! মাঝিরা ত তাদের দর্শনমাত্রেই ভীত হইয়া পড়িল। তারপর যখন তাহারা হস্তস্থিত বেত উঠাইয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল "আড্ডি

লেড়্কা লোগ্কো উতার্নে দেও, নেহী তো মার ডালেগা।" তখন 'আচ্ছা সাহেব, বহুত আচ্ছা সাহেব, আভি সাহেব' বলিতে বলিতে তখনই ঘাটে নৌকা ভিড়াইল ও আর সকলে ভয়ে যে যাহার নৌকায় সরিয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে সৈন্যিকদ্বয় সেদিন এরূপ প্রীত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে তাহাদের সহিত থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধন্যবাদের সহিত তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সাহসের পরিচয়স্বরূপ তাঁহার বাল্যজীবনের আরও তুই একটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে বৎসর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্-রূপে ভারতভ্রমণে আগমন করেন সেই বৎসর কলিকাতা বন্দরে বিলাত হইতে 'সিরাপিস্' নামক 'ড্রেড্‌নট্' জাতীয় একটা বড় মানোয়ারী জাহাজ আসিয়াছিল। তখন নরেন্দ্রের বয়স ১১ বৎসর। নরেন্দ্রের সঙ্গীরা ধরিয়া বসিল যে ঐ যুদ্ধের জাহাজখানা দেখিয়া আসিতে হইবে। জাহাজ দেখিতে হইলে বন্দরের বড় সাহেবের পাশ চাই, কিন্তু নরেন্দ্র কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন, তিনি চৌরঙ্গীতে বড় সাহেবের আফিসে গেলেন। সেখানকার চাপরাশী তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালক দেখিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল 'স'রে পড় না এখান থেকে, অতটুকু মানুষ আবার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছে! লড়ায়ের জাহাজ দেখ্‌তে যাবে! পালাঃ!' তাহার এবম্প্রকার সম্ভাষণে নরেন্দ্র প্রথমে একটু থতমত খাইলেন, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই তাঁহার ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিলেন পিছন দিকে একটা লোহার সরু সিঁড়ি রহিয়াছে। মনে হইল ঐখান দিয়া বোধ হয় বড় সাহেবের কামরায় যাওয়া যায়। যেমন মনে

হওয়া অমনি ধীরে ধীরে চাপারাশীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠা! উপরে উঠিয়াই দেখিলেন, ঠিক জায়গাতেই আসিয়াছেন, তখন পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে অনেক লোক, সকলেই সাহেবের নিকট আপনাপন আর্‌জী লইয়া উপস্থিত; তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটি দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যেই তাঁহার পালা আসিল অমনি সাহাবের সম্মুখে তাহা ধরিলেন। সাহেবও দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র উহা লইয়া আর পূর্ব্বপথে না গিয়া সোজাসুজি পথ দিয়া নীচে নামিলেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বারবান ত তাঁহাকে দেখিয়াই অবাক্, জিজ্ঞাসা করিল "তুম্ ক্যায়সে উপর মে গিয়া থা?" তিনি মুখভঙ্গী সহকারে "হাম যাদু জান্‌তা" এই বলিয়া তাহার উপর এক কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

স্বামী সারদানন্দ এই সময়কার আর একটি ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—"সিমলা পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে একটি 'জিম্‌ন্যাষ্টিকে'র আখড়া ছিল। হিন্দুমেলা-প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য আগমন পূর্ব্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক মিত্রজার সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহাদিগের উপরেই তিনি আখড়ার কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ায় একদিন একটি 'ট্রাপিজ' (দোল্‌না) খাটাইবার জন্য বালকেরা অশেষ চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম খাড়া করিতে পরিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য্য দেখিতে রাস্তায় লোকের ভিড় হইয়াছিল;

কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান ইংরাজ 'সেলার'কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া বালকদিগের সহিত যোগদান করিল। তথন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তলন করিতে লাগিলেন এবং সাহেব উহার পদদ্বয় গর্ত্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরূপে কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে এমন সময়ে দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আর্দ্র করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং তাঁহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন করিয়া তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাহেবের চৈতন্য হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া সম্মুখস্থ 'ট্রেণিং একাডেমি' নামক স্কুলগৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া শয়ন করাইয়া নবগোপাল বাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়া আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে, একসপ্তাহের শুশ্রূষায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই সুস্থ হইল। তথন পল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয়

দিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। ঐরূপে বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।”

সকল প্রকারে তিনি আদর্শ বালক ছিলেন। অন্যান্য বালকেরা যেমন খেলাধুলা করে তিনিও সেইরূপ করিতেন, বরং অন্যান্য বালক অপেক্ষা একটু বেশী রকমই করিতেন। কিন্তু নিভৃতে তাঁহার অন্তরের গোপনতম প্রদেশে একটা উচ্চতর ভাবের ধারা সদাই প্রবাহিত হইত। দেশ-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা কখনও কখনও ব্যক্ত হইয়া পড়িত। তখন তিনি আর বালক নহেন—বোধ হইত যেন যুগযুগান্তরের জ্ঞানরাজ্যের একজন পুরাতন পথিক। এই জ্ঞান-ধারা আমরা প্রকটিত দেখি তাঁহার শৈশবধ্যানে বা তন্ময়ত্বে, দেব-বিশেষের প্রতি অনুরাগে, সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও সন্ন্যাস-জীবনের আকাঙ্ক্ষায়। ইহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার পরিণত জীবনের আভাস সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আপনার মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করিতেন এবং এমন অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেন যাহা তাঁহার সমবয়স্ক শিশুদিগের সমক্ষে কখনও উপস্থিত হইত না বা হয় না। সে জিনিষগুলি তাঁহার ভিতরকার—নিজস্ব। অন্তরের গূঢ়শক্তি যে অনুক্ষণ আত্মপ্রকাশের জন্য একটা পথ খুঁজিতেছে ইহা শৈশবের ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও তিনি প্রায়ই অনুভব করিতেন। তিনি যে বাহিরে এত চঞ্চল ছিলেন এটা সেই অন্তর্যুদ্ধের ফল। আনন্দের আশায় সেই শক্তি তাঁহার প্রতি ইন্দ্রিয়ে, প্রতি অবয়বে ছুটাছুটি করিত এবং খেলাধূলা প্রভৃতি বহির্বিষয়ে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু বৈরাগ্যসিদ্ধ পুরুষের মন বাহ্য-বিষয়ে কত আনন্দ পাইবে? সে যে রস খুঁজিতেছে, যে আনন্দ-পারাবারের মধ্যে ডুবিয়া রহিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সে ত বাহিরে

নাই, সে যে ভিতরেই আছে! তাই তিনি যখন ধ্যানে তন্ময় হইতেন তখনকার তৃপ্তির নিকট খেলাধূলার তৃপ্তি যেন অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

পূর্ব্বে নিদ্রাবেশের প্রাক্কালে যে সকল অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা বলিয়াছি সে সকল দর্শন বরাবর হইতেছিল, কিন্তু তাহা ছাড়া আর একটির উল্লেখ এখানে করিব। ধ্যানকালে প্রথম প্রথম তিনি জোনাকীর আলোর ন্যায় বিন্দু বিন্দু আলোককণা দেখিতে পাইতেন, কিন্তু পরে দেখিতেন যেন একটা জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্য হইতে একখানা রশ্মিপূর্ণ মেঘ উড়িয়া আসিতেছে। ক্রমে সেটা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত ও সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করিত। এই জ্যোতিঃ দর্শনের সহিত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বাক্যে প্রমাণিত হয়।

পিতামাতার নিকট শিক্ষা

সন্তানের জীবনের উপর পিতামাতার প্রভাব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা সুবিদিত। স্বামীজির জীবনেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সাধারণতঃ বালকেরা পিতার নিকট হইতে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের আদর্শ এবং মাতার নিকট হইতে হৃদয়বৃত্তি ও নৈতিক আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই সিদ্ধান্তের ন্যূনাধিক ইতর-বিশেষ পরিলক্ষিত হইতে পারে।

স্বামীজি তাঁহার পিতার বিদ্যাবুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য ও বিবেচনা-শক্তিকে এতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে অন্য কোনও লোককে তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। কিন্তু যদি কখন পিতার কোন কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ না হইত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পিতৃমত খণ্ডন পূর্ব্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। এমন কি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পথ-প্রদর্শক পরমহংসদেবকেও তিনি প্রথম প্রথম অভ্রান্ত বলিয়া বোধ করেন নাই ও যেখানেই তাঁহার সহিত মতের অনৈক্য হইত সেই থানেই স্পষ্টবাক্যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই মত-বিরোধকে কেহ যেন আত্মগর্ব্বপ্রসূত প্রতিকূলাচরণ বলিয়া মনে না করেন। ইহা স্বমত-পোষনার্থ অন্ধ বিদ্রোহিতা নহে, কিন্তু প্রকৃত সত্যপরায়ণতা,—সত্যের জন্য যুক্তির সহিত যুক্তির সংঘর্ষ। তিনি প্রতি পদে বিচার করিয়া চলিতেন ও বিচার ব্যতীত কাহারও বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যাহা স্বীয় বিচার ও যুক্তিপ্রমাণের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই গ্রহণ করিতেন এবং যাহা প্রতিকূল

বিবেচিত হইত তাহার বিরুদ্ধে আপনার সমুদয় যুক্তিতর্ক নিঃশেষে প্রয়োগ করিতেন। এই যে স্বভাব—ইহা তাঁহার পিতারই শিক্ষার ফলে গঠিত হইয়াছিল। বিশ্বনাথবাবু পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশসাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ের আলোচনায় জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের আবশ্যক হয়, সেই সকল বিষয়েই তিনি পুত্রের সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিতেন এবং সর্ব্বদাই পুত্রকে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিতেন। আপন মত ঘাড়ে চাপাইয়া উহার ভারে কোমল শিশুবুদ্ধিকে পিষ্ট করিলে যে তাহা ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, সেই জন্য স্মৃতিশক্তির পরিচালনা দ্বারা কতকগুলি পুস্তক মুখস্থ করাকেই তিনি শিক্ষা মনে করিতেন না;—যদ্দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি দৃঢ় হয় তাহাকেই জ্ঞানার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামিজী এইরূপে পিতার নিকট হইতে প্রত্যেক বিষয়ের মূলসূত্রগুলি লাভ করিয়াছিলেন এবং সত্যকে সঙ্কীর্ণতার পরিধি অতিক্রম করিয়া উদার [illegible]দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক জিনিষের শুধু উপরিভাগ না দেখিয়া তলভাগ প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে উন্মেষিত হইয়াছিল, এবং পিতৃ-সাহায্যে তিনি জটিল যুক্তিতর্কের বহুবিস্তৃত জালের মধ্য হইতে সারভাগ নিষ্কাশন ও তাহাকে অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লোকসমক্ষে স্থাপন করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইতিহাসাদি সৎসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, ও যে শিক্ষা দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও লৌকিক ব্যবহারে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের জ্ঞান সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ শিক্ষা তিনি পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ব্যবহারিক

জীবনের বাস্তব সত্তার সহিত যে শিক্ষার সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই এরূপ শিক্ষা বা এরূপ চিন্তা ও জ্ঞানকে বিশ্বনাথবাবু নিতান্ত লঘুজ্ঞান করিতেন। বোধ হয় সেইজন্যই স্বামীজিও ধর্ম্মসম্বন্ধে মোটামুটি একটা প্রচলিত মত বা অন্ধবিশ্বাস এবং বস্তুতন্ত্রহীন দার্শনিক যুক্তিবাদের পরিবর্ত্তে সজীব ও সাক্ষাৎ অনুভূতির এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ও তাহাই লাভ করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বনাথবাবুর অন্তঃকরণ অতি উচ্চ ছিল এবং তিনি বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বহু ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জাতি বা বংশ দ্বারা লোকের মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করা তাঁহার স্বভাব ছিল না, যাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া পাইতেন তাহাকেই আদর ও সম্মান করিতেন। পরম্পরাগত জাতীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদিকেও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তদ্বিষয়ে একটা গৌরব অনুভব করিতেন। নরেন্দ্র বাল্যজীবনে পিতৃ-প্রকৃতির এই সব বিশেষত্ব বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হ[illegible]ছিলেন এবং তাহার প্রত্যেক ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্তরে স্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে বহু বিষয়ে নরেন্দ্র পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পিতার বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক টান ছিল জননীর উপর। জননীকে তিনি যথার্থ দেবী জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং সুখে দুঃখে, বাল্যে যৌবনে, সংসারে সন্ন্যাসে, স্বদেশে বিদেশে, সামান্য অবস্থায় এবং সম্মান ও যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়াও কখন তাঁহার কথা বিস্মৃত হন নাই। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে একবার কোন সূত্রে তিনি জননীর সাংঘাতিক পীড়ার

সংবাদ পাইয়া এতদূর কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না টেলিগ্রামে তাঁহার নিরাময় সংবাদ পাইয়াছিলেন ততক্ষণ তাঁহার চিন্তা-বিক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই প্রশান্ত হয় নাই। শেষ জীবনে তিনি প্রায় বলিতেন, "যে মাকে সত্য সত্য পূজা করিতে না পারে সে কখনও বড় হইতে পারে না।" তিনি একবার অনেক ভাবিয়া গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মা'র নিকট ঋণী।"

ভুবনেশ্বরী মাতা পুত্রদিগকে সতত এই উপদেশ দিতেন—'আজীবন সত্যপথে থাকিও, পবিত্র হইও, নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিও এবং কখনও অপরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না বা অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না। খুব শান্ত হইবে কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।'

'স্বাধীনতা রক্ষা করা' যে অতিশয় মহৎ বস্তু তাহা স্বামিজী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি উত্তর কালে কখনও অপরকে উপদেশ দিবার সময় জোর করিয়া নিজের মত গলাধঃকরণ করাইতেন না বা তাহাদিগকে আপন পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি শুধু পথনির্দ্দেশ করিতেন ও উচ্চ উচ্চ ভাব প্রদান করিতেন, তারপর যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তাহা গ্রহণ বা কার্য্যে পরিণত করুক।

বাল্যকালে স্বামীজি মাতার নিকট কোন কথা গোপন রাখিতেন না। মাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া ভাল হউক, মন্দ হউক, যখন যাহা করিতেন, দেখিতেন বা শুনিতেন ছুটিয়া আসিয়া মাকে তাহা না শুনাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। মেট্রপলিটান স্কুলে অধ্যয়নকালে একদিন ক্লাসের একটা কিম্ভূতকিমাকার বালকের

আচরণে ছেলেরা অত্যন্ত আমোদ বোধ করিতেছিল। শিক্ষক বালকটিকে ভৎসনা করিলে সে তাহা গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক বরং নির্লজ্জের ন্যায় উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্লাসের অন্যান্য বালকের পক্ষেও হাস্য সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র নিকটেই ছিলেন। তাঁহাকে ঐ হাসিতে যোগ দিতে দেখিয়া শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এমন ভাবে তাঁহার কান মলিতে লাগিলেন যে অবশেষে কর্ণ হইতে অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল। অপমানিত ও ব্যথিত নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ পুস্তক লইয়া ক্লাসের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে পূজনীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এই নৃশংস শাসনবিধি প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিক্ষককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন 'আমি জানিতাম তুমি একজন মানুষ, এখন দেখিতেছি তুমি একটা পশু।' তারপর তিনি নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত করিলেন। অন্যান্য বালকেরাও তাহাদের প্রণয়াস্পদ, দলপতি ও সর্ব্ববিষয়ে প্রধান সহপাঠীকে এবম্প্রকার অপমানিত হইতে দেখিয়া বিষম উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষককে সমুচিত তিরস্কার করায় সকলেই শান্ত হইল। তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে মেট্রপলিটান স্কুল হইতে দৈহিক দণ্ডবিধান-প্রণালী উঠিয়া যায়।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্র নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে আর একজন শিক্ষক তাঁহাকে ভূগোল পড়ায় ভুল হইয়াছে মনে করিয়া প্রহার করেন। নরেন্দ্র তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন 'আমার ভুল হয় নাই, আমি ঠিকই বলিয়াছি।' ইহাতে শিক্ষক আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হাত পাতিতে

বলিলেন ও হাত পাতিলে তাহার উপর সপাসপ কয়েক ঘা বেত্রাঘাত করিলেন। নরেন্দ্র নীরবে বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। ক্ষণকাল পরেই শিক্ষক মহাশয় বুঝিতে পারিলেন তাঁহার নিজেরই ভ্রম হইয়াছে। তখন নরেন্দ্রের নিকট আপনার ভ্রমস্বীকার করিলেন ও তদবধি আর কখনও তাঁহাকে সামান্য ছাত্রজ্ঞানে উপেক্ষা করেন নাই।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনাই স্বামীজি গৃহে গিয়া জননীর নিকট বিবৃত করেন। জননী তাঁহার বেদনায় সান্ত্বনা দান করিয়া বলিয়াছিলেন "বাছা, যদি তোমার ভুল না হইয়া থাকে তবে ইহাতে কি আসে যায়? ফল যাহাই হউক না কেন, সর্ব্বদা যাহা সত্য বলিয়া মনে করিবে তাহা করিয়া যাইবে। অনেক সময় হয়ত ইহার জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তথাপি সত্যকে কখনও ত্যাগ করিও না।"

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নরেন্দ্র মাতার এই উপদেশ পালন করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে এজন্য তাঁহাকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক সময় প্রিয় ও নিকটতম বন্ধুদিগের সহিতও মনান্তর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কখনও এক পদ বিচ্যুত হইতেন না।

আরও একটি উপদেশ এই সময়ে তিনি শিখিয়াছিলেন এবং আজীবন তাহা পালন করিয়াছিলেন। সেটি হইতেছে এই :—

"জীবনে মরণে কখনও কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইও না।"

নরেন্দ্রের যখন চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স (১৮৭৭ খৃঃ) তখন একবার তাঁহার পিতা মধ্য-প্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ গমন করেন। এই সময়ে নরেন্দ্র মেট্রপলিটানের তৃতীয় শ্রেণীতে

পড়িতেছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর রায়পুর গমনের কয়েক মাস পরে তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণও তথায় গমন করিলেন। তখন কেবল নাগপুর পর্য্যন্ত রেল লাইন ছিল। এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্য্যন্ত ট্রেণে যাওয়া চলিত, কিন্তু তাহার পর গো-শকট ব্যতীত সেই দীর্ঘপথ অতিবাহনের অন্য উপায় ছিল না। এক পক্ষেরও অধিক কাল ক্রমাগত গো-যানে যাইতে হইত। পথের দুই পার্শ্বে বিচিত্র-বৃক্ষলতা-ফল-পুষ্প-শোভিত বিবিধ-বন-বিহঙ্গ-কাকলী-পূরিত নিবিড় অরণ্য ও বিন্ধ্যাচলের গগনস্পর্শী শৃঙ্গমালা। 'ধীর মন্থরগতিতে চলিতে চলিতে গো-যান সকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থানে উপস্থিত হইল যেখানে পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।' বনস্থলীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে নরেন্দ্রের প্রাণে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হইল। পর্ব্বত-পৃষ্ঠ-নিবদ্ধ-দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন—একদিককার পর্ব্বতগাত্রের শিখর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাটালের মধ্যে 'মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন এমন একটা অনন্তের ভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্য সংজ্ঞার এককালে লোপ হইল।' স্বামিজী বলিতেন "কতক্ষণ যে ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গোযানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।" পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ বলেন "প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই বোধ হয় প্রথম।"

রায়পুরে স্কুল ছিল না, সুতরাং নরেন্দ্র অধিকাংশকাল পিতৃ-সন্নিধানে অবস্থান করিতেন। তাহার ফলে তিনি প্রত্যহ বিবিধ নূতন শিক্ষালাভ ও জ্ঞানসঞ্চয় করিতেছিলেন। এ শিক্ষা বিদ্যালয়ের মামুলী শিক্ষা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বনাথবাবু কিরূপ সযত্নে পুত্রের মনোবিকাশ সম্পাদনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রচলিত প্রথামত পুস্তক কণ্ঠস্থ ব্যাপারে পুত্রকে নিযুক্ত না করিয়া তিনি তাহার সহিত চিন্তার আদান প্রদান দ্বারা উচ্চভাবের বীজ বপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার জন্য অনেক সময় পিতাপুত্রে ঘোর তর্কযুদ্ধ বাধিয়া যাইত এবং ফলে কখনও পিতা কখনও বা পুত্র জয়লাভ করিতেন। নরেন্দ্র-জননী পুত্রের বিজয়লাভেই সমধিক আনন্দিত হইতেন।

ইহা ছাড়া বিশ্বনাথবাবুর বাসায় অনেক বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হইত। ইঁহাদের মধ্যে যে সকল বিষয় আলোচিত হইত, নরেন্দ্র তাহা স্থির হইয়া শ্রবণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তৎসম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতেন। বয়োবৃদ্ধগণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দর্শনে অনেক সময়ে তাঁহাকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন।

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এইরূপ একজন পিতৃবন্ধুর সহিত কথা বলিতে বলিতে একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে বহু গদ্য ও পদ্যাংশ আবৃত্তি করিয়া এরূপ স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন "বালক, একদিন না একদিন তোমার নাম আমরা শুনিতে পাইব।" যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে স্বামীজির বঙ্গসাহিত্য-রচনায় দক্ষতা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন ঐ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন সাহিত্যিকের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সার্থক হইয়াছিল।

তিনি আবাল্য এরূপ আত্মনির্ভরশীল ছিলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে কাহারও অপেক্ষা নিজেকে হীন মনে করিতেন না। তিনি যত বড়ই পণ্ডিত, জ্ঞানী, বয়োবৃদ্ধ বা সম্মানার্হ হউন না কেন বালক নরেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করিবার যো ছিল না। যদি কেহ কখনও বালক ভাবিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেন তবে আর তাঁহার নিস্তার ছিল না। একবার তাঁহার পিতার একজন বহুদিনের বন্ধু কোন এক বিষয়ে তাঁহাকে উপহাস করিয়া ঈষৎ অবহেলার ভাব দেখাইয়া ছিলেন। তিনি ইহাতে সে ব্যক্তির উপর চটিয়া গিয়া ভাবিতে থাকেন 'কি আশ্চর্য্য! আমার পিতা আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন না, আর এ লোকটা আমায় তুচ্ছজ্ঞান করে!' তেজে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'আপনার মত কতকগুলি লোক আছেন যাঁদের ধারণা বয়স কম হইলে বুঝি বুদ্ধি বিবেচনাও কম হয়; এটা কিন্তু নিতান্ত স্পর্দ্ধা ছাড়া আর কিছু নয়।' তিনি এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

এইরূপে বয়সে সুকুমার হইলেও বুদ্ধি ও শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ দিন দিন প্রবীণত্ব লাভ করিতেছিলেন।

তুই বৎসর রায়পুরে যাপন করিয়া বিশ্বনাথবাবু সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নরেন্দ্র তখন সর্ব্বাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিছেন। নিজের প্রতি তখন তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, শরীর বেশ পুষ্ট ও সবল হইয়াছে এবং সমবয়স্কদিগের তুলনায় যথেষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তুই বৎসর বাহিরে বাহিরে থাকায় শিক্ষকেরা তাঁহাকে প্রথমে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি করিতে সম্মত হইলেন না।

অবশেষে অতিকষ্টে 'বিশেষ অনুমতি' (special permission) পাইয়া তিনি ভর্ত্তি হইলেন। তারপর তিনি পুস্তক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং অনায়াসে তিন বৎসরের পাঠ এক বৎসরে আয়ত্ত করিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং মেট্রপলিটানের মধ্যে একমাত্র তিনিই সে বৎসর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য পিতার নিকট হইতে স্বামীজি একটি সুন্দর পকেটঘড়ি পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক প্রদর্শনীতে Boxing Competition এ (মুষ্টিযুদ্ধ পরীক্ষায়) প্রথম্ পুরস্কারস্বরূপ একটি মনোজ্ঞ রৌপ্যনির্ম্মিত প্রজাপতি উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নীও ঐ প্রদর্শনীতে মখমলের উপর সূচীকর্ম্মের জন্য সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পান।

বাল্যজীবনের শেষ কথা।

নরেন্দ্র যখন এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন বয়সের অনুপাতে তাঁহার বিদ্যাসঞ্চয় নিতান্ত সামান্য হয় নাই। সমগ্র পাটীগণিত ও উচ্চতর গণিতের কিয়দংশ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অনেকগুলি পুস্তক এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস—এইগুলি তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পুস্তকের কীট ছিলেন না। রঙ্গ তামাসা, আমোদ প্রমোদ, পড়াশুনা অপেক্ষাও ভালবাসিতেন এবং অভিনব ক্রীড়াকৌতুক উদ্ভাবনের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করিতেন।

তিনি রায়পুরে পিতার নিকট রন্ধনবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। 'সকলের চেয়ে ভাল রাঁধিব' এইরূপ একটা জেদ তাঁহার বরাবর ছিল। খেলার সাথীদিগের নিকট অবস্থানুসারে একআনা দুইআনা চাঁদা লইয়া মাঝে মাঝে 'চড়ুইভাতি' করা তাঁহার একটা প্রধান সখ ছিল। খরচার বেশীর ভাগ অবশ্য তিনিই দিতেন এবং পাকের কার্য্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন, তবে অন্যান্য বালকেরাও তাঁহাকে সাহায্য করিত। পোলাও, মাংস, নানাপ্রকার খিচুড়ী ও অন্যান্য বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য রন্ধন করা হইত। রন্ধন অবশ্য খুব ভালই হইত। কিন্তু তিনি খুব ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া মাংস প্রভৃতিতে অতিরিক্ত লঙ্কা দিতেন।

এই সময়ে বালক নরেন্দ্রের নবোদ্ভিন্ন জ্ঞানচক্ষু সদাজাগ্রত থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে মনের আহার অন্বেষণ করিতেছিল। রায়পুরে তিনি

দাবাখেলা শিখিয়াছিলেন এবং ভাল ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলাতেও জয়লাভ করিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালার প্রথম সূত্রপাত হয়। তিনিও অমনি তদনুকরণে একটি নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বাটীর লোক ও পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট এক আনা দর্শনীর মূল্য আদায় করিয়া এই নূতন সখ মিটাইবার খরচা যোগাড় করিতে লাগিলেন। তিনি সকল রকম ক্রীড়ায় আমোদ পাইতেন। ম্যাজিক্ লণ্ঠনের গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করিয়া তৎসাহায্যে সকলকে ছবি দেখান হইতে নৌকাবহা ও অসিচালনা কিছুই বাদ ছিল না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল সঙ্গীতে। তিনি আশৈশব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন ও অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীত-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত না উৎকৃষ্ট গায়ক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন ততদিন প্রগাঢ় অধ্য-বসায়ের সহিত সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই মিষ্ট ছিল, তাহার উপর শিক্ষা ও সাধনাগুণে উহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।*

তিনি আবাল্য কিরূপ তেজস্বী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার একস্থানে থিয়েটারের অভিনয় হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ আদালতের এক পেয়াদা ষ্টেজের উপর গিয়া এক প্রধান অভিনেতাকে

---

* সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার প্রতি তাঁহার পিতামাতা উভয়েরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামীজি বলিতেন তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি গাহিতে পারিতেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারীদিগের ভজন গান একবারমাত্র শুনিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

একখানি 'ওয়ারেণ্ট' দেখাইয়া বলিল 'আমি আইন ও আদালতের হুকুম অনুসারে আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।' সভামধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িবার উপক্রম হইল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একজন সতেজ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও, যতক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকগে। এরকম ক'রে সব লোককে বিরক্ত করবার মানে কি?" সকলেই সেই তীক্ষ্ণ স্বর শুনিয়া চিনিল। সে সুস্পষ্ট আদেশবাণী আর কাহারও নহে—নরেন্দ্রের। অমনি বিংশতিকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল--'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, শীগ্‌গির বেরোও।' যাহারা নিকটে ছিল তাহারা নরেন্দ্রের পীঠ চাপড়াইয়া বলিল "বাহবা ভায়া—বাহবা, তুমি না থাকলে আজ সব পণ্ড হ'ত।"

এইরূপ তেজস্বিতার জন্যই তিনি সকলের এত প্রিয় ছিলেন। খেলাধূলা ও দুষ্টামীতে তিনি সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বটে, কিন্তু ছেলেমানুষীর ভিতরেও মনুষ্যোচিত তেজ ও দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি প্রতিবেশিগণের সকলেরই স্নেহভাজন ছিলেন। বড় হউক, ছোট হউক, উচ্চজাতি হউক, নীচজাতি হউক, সকল পরিবারের সহিত তিনি একটা না একটা সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ চৌদ্দপনর বৎসরের বালক অপর পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু নরেন্দ্রের এরূপ সঙ্কোচভাব বিন্দুমাত্র ছিল না। প্রতিবেশীরা সকলেই যেন তাঁহার আপনার লোক ছিলেন। তিনি কাহাকেও 'পিসী' কাহাকেও 'মাসী' কাহাকেও 'খুড়ী' কাহাকেও 'মামী' কাহাকেও বা 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এমন কি একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোককেও তিনি 'মাসী' বলিয়া ডাকিতেন।

কাহারও নিকট তাঁহার লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না। যে বাটীতে যাইতেন তাহাই যেন তাঁর নিজের বাটী। এইরূপে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন এবং তিনিও নিকট আত্মীয়জ্ঞানে তাঁহাদিগের সহিত সরল হাস্যালাপ করিতেন, আবার তাঁহাদের ব্যথার ব্যথী হইয়া বিপদে সাহায্য ও সান্ত্বনা দান করিতেন।

গল্পবর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। 'আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যু' বা ঐরকম একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প বর্ণনা করিয়া কল্পনাপ্রবণ বাল্যসখাদিগের সরল প্রাণে কৌতুহলের তুফান সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ছিল।

বাস্তবিক তিনি সর্ব্ববিষয়ে চূড়ান্ত বালক ছিলেন। সহৃদয় তেজস্বী, প্রখরবুদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ,—খেলা ধূলা আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত,—যে কোন নূতন বিষয় দেখিবার ও শুনিবার জন্য ব্যগ্র এবং যে কোন বাধা বিঘ্ন অতিক্রমে উৎসাহশীল ও উদ্যোগী। এবিষয়ে তিনি আমাদের দেশের সাধারণ বালকদিগের মত 'মুখবোজা ভালমানুষ'টি বা 'সাতচড়ে কথা কয়না' 'ন'ড়ে ভোলা' গোছের ছিলেন না। ঠিক সাহেবদের ছেলের মত,—কর্ম্মক্ষম, চঞ্চল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দীপ্ত হুতাশনের মত তেজঃপূর্ণ।

Vivekananda

কলেজে।

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের বাল্যক্রীড়ার অবসান হইল। যে সকল সহচরগণে পরিবৃত হইয়া তিনি নিত্য নূতন ক্রীড়া-কৌতুক অনুসন্ধানে রত থাকিতেন এক্ষণে তাহাদের অনেকেরই নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে ভাবিয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাজনিত আনন্দের মধ্যেও তিনি দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হায়! যাহাদিগের সহিত এতকাল আমোদ প্রমোদে কাটিল, যাহাদিগকে তিনি কত অদ্ভুত অদ্ভুত আদরের নামে সম্ভাষণ করিতেন, যাহারা তাঁহার নেতৃত্বে কত সুখ ও গৌরব অনুভব করিত, এক্ষণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! সেই বিদ্যালয় গৃহ—যাহা তাঁহার ক্রীড়াশব্দে প্রতিধ্বনিত হইত, সেই ক্লাস—যেখানে তিনি সকলের প্রথম ছিলেন—সবই ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কোমলহৃদয় নরেন্দ্রের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। এখন কলেজে পড়িতে যাইতেছেন, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হইতে হইবে, আর ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিবেন না, সৈনিকদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দূর দূর স্থানে 'মার্চ্চ' করিয়া যাইতে বা কৃত্রিম রণ-অভিনয় করিতে পারিবেন না, এই সকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যথার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং তিনি নূতন জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যে শীঘ্রই আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

প্রথমে তিনি 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পরবৎসর উহা ত্যাগ করিয়া 'জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে'

গমন করিলেন। কলেজে প্রবেশের পর দুই বৎসর নরেন্দ্র পাঠাদিতে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিলেন এবং বিশেষভাবে সাহিত্যের অনুশীলনে রত হইয়া রচনা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। Logic (ন্যায়), Philosophy (দর্শন)ও খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজীভাষায় রচনা, বক্তৃতা ও কথোপকথন শিক্ষার জন্য অধিকতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই এ সকল বিষয়ে কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। বিদ্যার্জ্জন দ্বারা মনো-মন্দির ভূষিত করিতে হইবে—এখন হইতে ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল।

ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বহুদিন হইতে সঞ্চিত ছিল। একবার মেট্রপলিটান স্কুলে ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণ-উপলক্ষে একটী সভা হয়, সঙ্গে সঙ্গে একজন শিক্ষকেরও বিদায় গ্রহণ করিবার কথা ছিল। নরেন্দ্রের সহপাঠীরা তাঁহাকে ধরিয়া বসিল যে ঐ শিক্ষককে একটি বিদায়-অভিনন্দন দিতে হইবে, নরেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। সেদিন বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্ভীক নরেন্দ্র অতি সপ্রতিভভাবে সকলের সমক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া ইংরাজীতে উক্ত শিক্ষকের স্থানান্তর গমনে ছাত্রদিগের হৃদয়ে কিরূপ ক্লেশ হইতেছে তৎসম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করিলেন। ইহার বহুদিন পরে সুরেন্দ্রবাবু স্বামীজির সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "He was the greatest public orator India had ever known," (ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় বক্তা জন্মগ্রহণ করেন নাই)। কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্র বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করিতেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই বাক্‌পটু ছিলেন,—অভ্যাস না করিলেও বাগ্মিতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। সুবক্তা

হইতে গেলে যে সকল গুণের আবশ্যক তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি, সুললিত অথচ মেঘমন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি এবং সুচারুবচনবিন্যাস ও আবৃত্তি প্রণালী দ্বারা শ্রোতার চিত্তাকর্ষণের ক্ষমতা—সকলই তাঁহার ছিল।

যাঁহারা কলেজে নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে তিনি নিজের ক্ষমতা উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং অতি স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষমতার ব্যবহার করিতেন। দেশী বিলাতী সব অধ্যাপকই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন ও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেন, 'এই বালকের মধ্যে প্রভূত শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এমন দিন আসিবে যেদিন সমগ্র জগৎ তাহার পরিচয় পাইবে।'

দুই বৎসর পরে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস্ (এফ, এ,) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতে লাগিলেন এবং আর দুই বৎসর পরে অর্থাৎ কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এল, পড়িতে সুরু করিলেন। ইতিমধ্যে—অর্থাৎ বি, এ, পাশ করার অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি নানা সাংসারিক গোলযোগে ও বিষম অন্নকষ্টে পতিত হন। সুতরাং বি, এল, পাশ করিবার সুযোগ আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই (বি, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করার সময়ে) তাঁহার মনোরাজ্যে বিষম চিন্তা-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। সে বিষম অন্তর্ঝটিকা পিতৃবিয়োগে আরও প্রবলতর রূপ ধারণ করে, কিন্তু পরিশেষে পরমহংসদেবের পদাশ্রয়ে এ ঝটিকা প্রশমিত হয় এবং তিনি সন্দেহ-তরঙ্গের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া প্রকৃত পন্থা নির্দ্ধারণে সমর্থ হন। এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; এখানে শুধু সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস প্রদত্ত হইল। ফার্ষ্ট আর্টস্ পাশের পর হইতে অর্থাৎ ১৮

বৎসর হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ইতিহাস অতি চিন্তা-কর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। যে বিরাট শক্তি শীঘ্রই সভ্যজগতে তুমুল আন্দোলন উথাপিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিবামাত্র সে আর ক্ষুদ্র রক্ত-মাংসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না, আত্মপ্রকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই দেখা যায় এই বয়ঃসন্ধিকালই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়। এই সময়েই তাঁহারা সাধারণ ও স্বীয় অসাধারণ গন্তব্যপথের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া 'কোন্ পথে যাই, কোন্ পথে গেলে ইষ্টলাভ—সত্য লাভ হইবে—জীবন ধন্য ও সফল হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও সার্থক হইবে!' এবংবিধ সমস্যাজালে নিপতিত হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা আপন পথ ঠিক করিয়া ফেলেন এবং এই জাল কাটিয়া বহির্গত হন। পাঠক দেখিবেন স্বামীজির জীবনেও এই প্রকার হইয়াছিল। উপস্থিত আমরা কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁহার চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

স্কুলের ন্যায় কলেজেও তিনি শীঘ্রই সকল বালকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পদে পদে অপরাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে সকলে আপনা হইতেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। প্রণালীবদ্ধ চিন্তা, তর্ক ও যুক্তিতে কেহ তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ক্লাসে তর্ক আরম্ভ হইলে খেলার সময় পর্য্যন্ত তাহার জের চলিত। যুক্তি ও বিচার সাহায্যে প্রত্যেক জিনিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করা এখন হইতেই তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল। বলা-কহায় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রহস্য বিদ্রূপে, আমোদ প্রমোদে, ক্রীড়ায় সঙ্গীতে, সকল বিষয়েই তিনি

সমান অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার সিংহবিক্রমে সকলে যেন তটস্থ থাকিত। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি পূর্ব্ববৎ নূতন একটা কিছু শুনিতে বা করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেইদিকে ছুটিতেন। কিন্তু স্কুলে পড়িবার সময় যেমন অধিকাংশ কালই ক্রীড়ামগ্ন থাকিতেন কলেজে পড়িবার সময় সেরূপ ছিলেন না। কলেজ-জীবনে তিনি খুব অধ্যয়ন-রত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অধ্যয়ন শুধু কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ ছিল না। নভেল, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িব রচনাদির প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। তা ছাড়া গণিত, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকারের দর্শনই বিশেষ মনোযোগের সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি বিস্তৃত ও উদার ছিল। একবার একজন সহপাঠী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পরীক্ষার জন্য তিনি গ্রাহ্য করেন না কেন। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"পরীক্ষাটা কিছুই নয়, পাশ করাই ত জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আর পাশের জন্য পড়া মুখস্থ করা মানে শুধু স্মরণশক্তির অপব্যবহার করা। পাশটা শুধু করিতে হইবে বলিয়া যতটুকু পড়া দরকার তাহাই করা উচিত।" তিনি বলিতেন, 'এখনকার ছাত্রদের লক্ষ্য জ্ঞানার্জ্জন নয়, তাই দেখি 'ডিগ্রী'টা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়াশুনার শেষ। প্রকৃত জ্ঞানলাভ কাহাকে বলে, তাহার উদ্দেশ্য কি ও চরিত্রের উপর তাহার প্রভাব কতদূর—এ সম্বন্ধে এ দেশের ছাত্রদের বেশ পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত।' এ বিশ্বাস তাঁর শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন নিজের পাঠ্যবিষয় স্থির করিয়া মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন।

কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি যে সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য

বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গণিত ও গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) অন্যতম। জ্যোতিষে তাঁহার সবিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি 'Godfrey's Astronomy' নামক পুস্তকখানি সমগ্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের গণিত (Higher Mathematics) অভ্যাসে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। বার বছর বয়সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমুদয় সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং চৌদ্দ বৎসরে সংস্কৃতে বেশ সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ ছিল বাঙ্গলা ভাষার প্রতি।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত রকমের ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে তাঁহার জননীর সহিত তাঁহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহার মাতার নিকট কোন কবিতা একবার পাঠ করিলে তিনি তারপর যে কোন সময়ে আগাগোড়া তাহা মুখস্থ বলিতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথে এই শক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র যে কোন বিষয়ে অল্পক্ষণেই মনঃসংযম করিতে পারিতেন এবং তাহার পর সে বিষয় আর কখনও তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইত না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সময়ে সময়ে যেন দৈবানুগৃহীত বলিয়া মনে হইত ও তদ্দর্শনে সাধারণ লোকের বিস্ময় ও ভক্তির সীমা থাকিত না। তিনি যে জিনিষ একবার শুনিতেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার প্রতি পংক্তি আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকার বলেন "শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের ন্যায় ছিল না। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন 'তিনি

বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া কোন্ পুস্তকের কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত সেদিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাষ্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপ ভাবে পুস্তকগুলির ঐ সকল স্থানের শব্দ, অর্থ সকল বিষয় দুই তিনবার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐ সকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।' বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার দুই তিন মাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক সকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; অন্য সময়ে আপন অভিরুচিমত অন্য পুস্তক সকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। ঐরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালার সমগ্র সাহিত্য ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও কখনও অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্ব্বোক্ত কথা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন 'প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভের দুই তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি, জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই; তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম।' ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।"

পাঠানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি এই মেধাশক্তি নরেন্দ্রের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। অধীত বিষয়গুলি তিনি প্রয়োজন মত অতি সত্বর স্মৃতিপথে পুনরুদিত করিতে পারিতেন। তা' ছাড়া এত অল্প সময়ে বহু বিষয় অধিকার করিতেন এবং সে সকল বিষয় এত দীর্ঘকাল

পর্য্যন্ত স্মরণারূঢ় থাকিত যে, অন্যের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে যাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেকে এখনও জীবিত থাকিয়া নিজ মুখে এ বিষয়ের প্রমাণ দিতেছেন। সেই জন্য আমরা এরূপ অসম্ভব ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা বলেন, যে পুস্তক তিনি একবার পাঠ করিতেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় প্রায় সমস্ত দিন বন্ধুবান্ধবদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া অধিক রাত্রে ইতিহাস বা দুরূহ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় মগ্ন হইতেন এবং ৪০।৫০ পৃষ্ঠা শেষ করিয়া উঠিতেন। ঐ ৪০।৫০ পৃষ্ঠা সেদিন হইতে তাঁহার মনের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া যাইত। অধিক রাত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া তিনি চা ও কফি পানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এত স্মৃতিশক্তি যাঁহার, তাঁহার পক্ষে অল্প দিনে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করা বিচিত্র কি? ইতিহাস পাঠে তাঁহার বরাবরই অনুরাগ ছিল। শুধু ঘটনাসমূহের বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া একটা জাতি বা তদন্তর্গত শক্তিশালী পুরুষদিগের ক্রিয়া সমূহ প্রকাশ পায়, ইতিহাস পাঠ দ্বারা সেই সকল অবস্থার পরিচয় লাভ ও পর্য্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেন। Green's History of the English People (ইংরাজ জাতির ইতিহাস), Alison's History of Europe (য়ুরোপের ইতিহাস) ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সবিশেষ ভাবে পড়িয়াছিলেন Gibbon's Decline and fall of the Roman Empire (রোমক সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস)। অতুলবিক্রম সম্রাট নেপোলিয়নকে

তিনি প্রকৃত বীর বলিয়া সম্মান করিতেন এবং নেপোলিয়ানের সেনাপতিদিগের মধ্যে 'মার্শাল নে'-কে খুব উচ্চাসন প্রদান করিতেন। দুর্ব্বলতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, বিশেষতঃ যখন তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞান এই সকল বীরবৃন্দের চিত্র তাঁহার কল্পনার সম্মুখে আনিয়া ধরিত। শক্তিসঞ্চয়ই যে মহৎ কার্য্যের দ্বারস্বরূপ ইহা তিনি জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু অপরাপর দেশের ইতিহাস পাঠেই পরিতুষ্ট ছিলেন না। ভারত-বর্ষের ইতিহাস ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত তিনি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন যে, বোধ হইত যেন সকলই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় হিন্দুনৃপতি ও মোগল বাদশাহগণের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে তিনি সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। উত্তরকালে যখন তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সমস্ত ভারতভূমি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন এই সব প্রাচীন কাহিনী, সেই বহুবর্ষাতীত ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহ-সন্দর্শনের সহিত যুগপৎ তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া ভারতের বিগত গৌরবের কল্পনাময়ী মূর্ত্তির নিকট তাঁহার হৃদয়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত করিয়া ফেলিত এবং ভাবোদ্বেলিত হৃদয়ে তিনি নিরীক্ষণ করিতেন যেন ঐ সব অতীত গৌরব শুধু ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে।

যুবক মাত্রেই সাধারণতঃ কাব্যানুরাগী হইয়া থাকেন। নরেন্দ্রও পঠদ্দশায় কবিতার অতিশয় ভক্ত ছিলেন। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে Wordsworthকেই তিনি কাব্যগগনের ধ্রুবতারা বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলেন এবং উক্ত কবির উচ্চভাবপূর্ণ কবিতার অধিকাংশ স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ছন্দোঝঙ্কারপূর্ণ শব্দবিন্যাস মাত্রকেই কবিতা মনে করিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত

চিত্রপটের ন্যায় একখানি মনোরম শব্দময় চিত্র বিশেষ। ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প, সত্যকে সাধারণ জগতের অঙ্গীভূত করিবার একমাত্র কৌশল। তাঁহার Ideal বা আদর্শ চিরজীবন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি এই স্বরচিত আদর্শজগতেই বাস করিতেন এবং মনে করিতেন মানব-জীবনের ভিত্তি এই অন্তরের অন্তরতম আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত, আর জীবনের ব্যর্থতার কারণ শুধু এই আদর্শের সম্যগ্‌দর্শনাভাব। তিনি যাহা করিতেন, যাহা ভাবিতেন সবই তাঁহার হৃদয়নিহিত আদর্শের পরিপোষক ছিল। ইতিহাস, কাব্য, দর্শন বা বিজ্ঞান সবই তাঁহার চক্ষে সেই আদর্শের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু বোধ হইত না।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন প্রকৃত সত্যলাভের জন্য বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বি. এ. ক্লাসে পড়িবার সময় তিনি পিপাসিত চাতকের ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সত্যানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! পুস্তকের মধ্যে সে সত্য কোথায়! তাই পরবর্ত্তী কালে Song of the Sannyasin (সন্ন্যাসীর-গীতি,) শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

—'Where seek'st thou? That freedom, friend, this world
Nor that, can give. In books and temples vain
Thy search!—

অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর?
পাবে না ত হেথা, কিম্বা এর পর;
শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ;—

হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের দুর্ব্বোধ্য দর্শনের প্রতিই তিনি সমধিক আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন এবং উহা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'ক্যাণ্ট' ও 'শোপেণহয়ার' নামক জর্ম্মন পণ্ডিতদ্বয়ের এবং 'আগষ্ট কোমৎ' ও 'জনষ্টুয়ার্ট মিলে'র দার্শনিক মতও উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি প্রাচীন 'আরিষ্টটল' মতও উপেক্ষা করেন নাই। এই সকল অধ্যয়নের ফলে এসময়ে তাঁহার হৃদয়ে কি ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব। এখন পাঠক শুধু এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, এই সকল দার্শনিক মতবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন উত্তরকালে সাধারণকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষেও বিপক্ষবর্গের বিরুদ্ধ মত খণ্ডন পক্ষে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য-টীকা প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সমুদয় টীকা-ভাষ্য নির্ভুল হইতে পারে, কিন্তু তিনি দেখিলেন উহাদিগকে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথম প্রথম হিন্দুদর্শন-সমূহ পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, বুঝি ইহাদের ভিত্তি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত, এক আঘাতেই উহা চূরমার হইয়া যাইবে। এই বিষম সন্দেহ যতদিন পর্য্যন্ত না অপসৃত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিদারুণ অন্তর্যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। তারপর বিশেষ একাগ্রতার সহিত পাশ্চাত্যদর্শন অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন, হিন্দুদর্শন যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সত্যকে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে পাশ্চাত্যদর্শনের মূল সূত্রগুলি শুধু তাহারই ক্ষীণ আভাস মাত্র। তাহারা সেই পূর্ণ সত্যের দিকে কতকটা মাত্র অগ্রসর হইয়াছে।

অধ্যয়নের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও আমোদপ্রিয়তা বর্জ্জন করেন নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও

কোন একটা নূতন জিনিষ বা বিষয় দেখিলেই সব ত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতেন। ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় রসিক কেহ ছিল না। কোন ঘটনায় কৌতুকের দিকটা সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তাঁহার সহধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকেই স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় ছিলেন। একে এই রঙ্গপ্রিয় প্রকৃতি, তাহার উপর আবার যখন সকলে একত্র হইতেন তখন তাঁহাদের স্ফূর্ত্তির বহর দেখে কে? এমন অনেক দিন গিয়াছে যেদিন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া সকলে সারা কলিকাতার পথে গান গাহিয়া বেড়াইয়াছেন। রবিবার বা অন্যান্য ছুটীর দিনে সকলে একত্রে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ, লম্ফ ঝম্প, জলক্রীড়া হইত ও সঙ্গে সঙ্গে হাসি-তামাসা-গল্পের বান ডাকিত। পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে রাজপথসমূহ আলোকমালায় বিভূষিত হইলে এই সকল যুবকদল ভ্রমণে বহির্গত হইতেন ও উচ্ছ্সিত আনন্দের রোলে গগন বিদীর্ণ করিতেন।

নরেন্দ্র ছিলেন ইঁহাদের দলপতি। যাহাতে সকলেই ষোল আনা আমোদ উপভোগ করিতে পায় সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। কিন্তু এই সকল আমোদের কোনটিতেই দোষের সংস্পর্শ থাকিত না। যৌবনে প্রাণ ও মনের স্ফূর্ত্তি প্রাকৃতিক নিয়ম, এ আমোদ তাহারই ফল; কিন্তু ইহাতে কলুষের লেশমাত্র ছিল না। এই সকল সরল, নির্দ্দোষ, পুরুষোচিত আমোদ উপলক্ষে নরেন্দ্রের সহিত অনেকের আমরণ সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। নরেন্দ্র-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল—পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা। এবিষয়ে তাঁহার আদর্শ অতি উচ্চ ছিল এবং এ আদর্শ হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুতি বা খর্ব্বতা তাঁহার সহ্য হইত না। যৌবনকাল অতি সঙ্কটময়। আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে ধীরে

ধীরে অলক্ষ্যে পাপের পথে পদার্পণ করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু বাল্যে মাতার নিকট নরেন্দ্র শিখিয়াছিলেন সৎ কি, সাধুতা কাহাকে বলে, আর যৌবনে নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন, বিচার ও চিন্তাশীলতা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন পবিত্রতা কি, সাধুতা কি। সেইজন্য শত আমোদ প্রমোদের মধ্যেও তিনি চরিত্রের বিশুদ্ধতা হারান নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার একজন যৌবনসহচর (ইনি পূর্ব্বে সুনীতি কুনীতির বিশেষ ধার ধারিতেন না কিন্তু পরে স্বামীজির মতানুবর্ত্তী হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন) বলেন "যৌবনে স্বামীজি পবিত্রতার জ্বলন্ত বিগ্রহ ছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রায়ই over puritanical (অতিরিক্ত মাত্রায় পবিত্রতাভক্ত) বলিয়া ঠাট্টা করিতাম, কিন্তু এক এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে গেলে যেন কথা আটকাইয়া যাইত,—স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম তাঁর তুলনায় আমি কত হীন!" তিনি আরও বলেন "নরেনের ভেতর থেকে যেন একটা আধ্যাত্মিক তেজ ফুটে বেরোত, তার কাছে তিষ্ঠান যেত না।" শুধু ইনি নহেন, নরেন্দ্রের অন্যান্য বন্ধুরাও তাঁহার মধ্যে ঐরূপ তেজ লক্ষ্য করিয়া ছিলেন। সারা জীবন নরেন্দ্র-চরিত্র এই পবিত্রতার মহিমময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। কি ধর্ম্ম, কি ঈশ্বর—সবই তিনি ইহার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। এই পবিত্রতাই তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। তিনি স্ত্রীলোকমাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধন করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতই অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগকে মাতৃরূপা জ্ঞান করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠের সময় হইতেই তিনি রীতিমত গীত বাদ্যের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী-

গুপ্ত নামে একজন ওস্তাদের নিকট তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন। বিশ্বনাথবাবু বাল্যাবধি পুত্রের সঙ্গীতপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে উহাতে সম্যক্ অধিকার জন্মে না জানিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে নরেন্দ্র ওস্তাদের নিকট হইতে রাগরাগিণী শিক্ষা করেন ও তাল-মান-লয় সম্বন্ধে বিধিমত উপদেশ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে নরেন্দ্র চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ঐ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যেখানে যাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন,—সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ন্যায় খাতির যত্ন করিত এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন 'অথরিটি' (প্রমাণস্বরূপ) বলিয়া গণ্য করিত। প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি, কোন দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং শেষে নিজেও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুরু তাঁহার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা নিজের মুখোজ্জ্বল হইবে জানিয়া তাঁহাকে শিখাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট অনেক হিন্দী, উর্দ্দূ এবং ফার্সী গানও শিখিয়াছিলেন। ঐগুলির অধিকাংশ মুসলমানদিগের পর্ব্বাদিতে গীত হয়।

জেনারেল এসেম্‌ব্লীজ কলেজের ছাত্রেরা প্রায়ই দল বাঁধিয়া

তাঁহার গান শুনিতে বসিত। একদিন একজন ইংরাজ অধ্যাপক ক্লাসে আসিতে কিছু দেরী করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ক্লাশে প্রায় দুইশত ছাত্র ছিল। অধ্যাপকের আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া তাহারা সকলে নরেন্দ্রকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিল, কারণ সময়টা তাহা হইলে বেশ কাটে। নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন, আর সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ক্লাসের নিকট আসিয়া মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে স্তব্ধ হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং গান থামিলে সহর্ষবদনে ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। ক্লাসে প্রবেশ করিয়া তিনি গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন,—অবশ্য তাঁহার নাম কেহ তাঁহাকে বলিল না।

পাঠক দেখিবেন স্বয়ং পরমহংসদেবও নরেন্দ্রের এই সুকণ্ঠের সঙ্গীতে একদিন মুগ্ধ হইয়া ভাবাবিষ্ট ও সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং খেতড়ি রাজসভাতেও তিনি দরবারী, কানাড়া, ইমন কল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

বন্ধুবর্গের নিকট অবস্থানকালে নরেন্দ্র প্রায়ই সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। তাঁহারাও 'এনকোর' 'এনকোর' ('চলুক' 'চলুক') ধ্বনিতে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ দিতেন না। তিনিও উৎসাহে অধীর হইয়া ক্রমশঃ গানে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া চলিয়া যাইত কেহই টের পাইতেন না। এখনও অনেকে বলেন যে, যখন তিনি একাকী থাকিতেন হয়ত গাহিতে গাহিতে এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে আহার করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন এবং কতখানি সময় যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেন না। কোন কোন দিন এমন হইত যে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে তেল মাখিতে বসিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে গান ধরিয়াছেন

এদিকে হয়ত খুব তাড়াতাড়ি খাইয়া বাহির হইতে হইবে,—কিন্তু গান আরম্ভ করিয়া আর স্নান বা খাওয়া দাওয়ার কথা মনে নাই, একেবারে তাহাতে ডুবিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের উপর এমনই তাঁহার ঝোঁক ছিল।

তিনি যেমন গাহিতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারিতেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে 'বীরোচিত কলা' বলিয়া নৃত্যবিদ্যার খুব আদর ছিল এবং ধর্ম্মোৎসবাদির সময় নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। নরেন্দ্র স্বাভাবিক কলানুরাগ বশতঃ নৃত্যকালে অঙ্গসঞ্চালনের মাধুর্য্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন, আর সেই সঙ্গে যদি সঙ্গীতটি উচ্চভাবব্যঞ্জক হইত তাহা হইলে ভাবের প্রেরণায় নৃত্যসৌষ্ঠব আরও বর্দ্ধিত হইত। এ বিষয়ে তিনি ঠিক গ্রীকদের মত ছিলেন। আশৈশব সৌন্দর্য্যানুরাগী, স্বয়ংও সুন্দরদর্শন। তাহার উপর বহিঃসৌন্দর্য্যের সহিত আন্তর-সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধবেত্তা, সুতরাং তাঁহার সুকণ্ঠের সুধাস্রাবী সঙ্গীত ও তৎসহ ললিত বপুর তরঙ্গায়িত ভঙ্গী যুগপৎ শ্রোতা ও দর্শকের প্রাণ হরণ করিত। এ সময়ে বন্ধুবান্ধবদের কোন উৎসব সভা হইলে তিনি যদি সে স্থলে উপস্থিত না থাকিতেন তবে মনে হইত যেন সভার অঙ্গহানি হইয়াছে। কারণ তাঁহার মত আনন্দ-তুফান তুলিতে কেহই পারিত না। তাঁহার সংস্পর্শ মাত্রেই স্থানটি যেন চঞ্চল ও প্রাণময় হইয়া উঠিত এবং সভা-মধ্যে একটা হর্ষের হিল্লোল বহিয়া যাইত। তাঁহার সকল রকম গান জানা ছিল। যে যেমন চাহিত তাহাকে সেইরূপ গান শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং সাগ্রহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে 'নরেন কোথা?' 'নরেন কোথা?' 'তাকে সঙ্গে আন নি কেন?'—এইরূপ একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। তিনি না আসা পর্য্যন্ত আসর যেন বেশ জমিত না এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। সমস্ত কলেজ-জীবনটা ভোর তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগের

নিকট এইরূপ প্রেমাস্পদ বন্ধু ছিলেন এবং গল্প, রহস্য ও ক্রীড়া কৌতুকাদি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

গান বাজানার সঙ্গে আর একটা জিনিষের উপর তাঁহার ঝোঁক ছিল। সেটি হইতেছে অভিনয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে সময়টা এদেশে রঙ্গালয়ের জন্মকাল। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে এবং সামাজিক আমোদ প্রমোদে ভদ্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অভিনয়ের বেশ প্রচলন হইয়াছে। নরেনও সখের অভিনয় আরম্ভ করিয়া বন্ধুদিগের হৃদয়ে অভিনয় প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিলেন। তবে তিনি যে সকল বিষয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন চিত্তের উন্নতি সাধনই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিত। কেশববাবুর 'নববৃন্দাবন' নাটক অভিনয় কালে তিনি 'যোগী'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সুগঠিত অবয়ব দর্শনে সকলেই পুলকিত হইতেন। সে অবয়বে সিংহাবয়বের সৌন্দর্য্য ছিল। তার উপর প্রাণটী খোলা, সাদা ও সদাই স্ফূর্ত্তিসমুদ্রে ভাসমান। আর তিনি সহজেই সব কাজে গা ঢালিয়া দিতেন। সকল আমোদ আহ্লাদ রঙ্গস্রোতে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে সমর্পণ করিতেন।

উপরোক্ত আমোদ প্রমোদ ব্যতীত অন্য কয়েকপ্রকার ক্রীড়ায়ও নরেন্দ্র খুব যোগ দিতেন। এগুলিতে প্রভূত অঙ্গচালনার আবশ্যক হয়। যথা, দৌড়ান, লাফান, কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, সন্তরণ প্রতিযোগিতা, দাঁড় টানিয়া গঙ্গাবক্ষে বিচরণ, ফাঁকা মাঠে বহুদূর পর্য্যন্ত দ্রুত ভ্রমণ ইত্যাদি। যে সকল খেলায় শরীর দৃঢ় ও সবল হয়, হৃদয়ে সাহস আসে, মনের তেজ বাড়ে তাহাতে তিনি বালককাল হইতেই অনুরাগী ছিলেন। তৎফলে তাঁহার মাংসপেশীগুলি শক্ত ও পুষ্ট হইয়া দেহের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধন করিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই তিনি ঘোড়া ভালবাসিতেন। তাঁহার আত্মীয়ের একটা সাদা 'পনি' ঘোড়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া তাঁহার একটা প্রধান সখ ছিল। তিনি যে জিমন্যাষ্টিকের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন সেখানে লাঠিও খেলা হইত। লাঠির প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আসক্তি ছিল। কতকগুলি মুসলমানের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, তাহাদের নিকটই লাঠিখেলা শিক্ষা হয়। কত অল্প বয়সে তিনি লাঠিখেলায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর। মেট্রপলিটান স্কুলে পড়েন। একটা মেলা উপলক্ষে জিমন্যাষ্টিকের খেলা দেখান হইবার কথা ছিল। তিনিও দর্শকরূপে সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য খেলা শেষ হইলে লাঠি খেলা আরম্ভ হইল এবং ক্রমশঃ খেলার উৎসাহ কমিয়া আসিল, এমন সময়ে সহসা নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোষণা করিলেন—তাহাদের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনে সম্মত, তিনি তাহারই সহিত খেলিতে প্রস্তুত। দলের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান সেই তাঁহার সম্মুখীন হইল। তারপর ঘোর শব্দে লাঠিযুদ্ধ চলিল। দর্শকেরা ক্রীড়ার ফল দেখিবার জন্য বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, কারণ নরেন্দ্র অপেক্ষা নরেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীর বয়স ও শারীরিক শক্তি দুইই অধিক ছিল। কিন্তু মুসলমান ওস্তাদদের শিক্ষা-গুণে নরেন্দ্র লাঠি-চালনায় এমনি পরিপক্ক হইয়াছিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি সামর্থ্যকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া পঁয়তাড়া কসিতে কসিতে হঠাৎ কৌশলে তাহাকে এরূপ প্রচণ্ড আঘাত করিলেন যে, তাহার হস্তস্থিত যষ্টিখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া ঝন ঝন শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে দর্শকবৃন্দের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল

না। নরেন্দ্র জিতিলেন বলিয়া সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইলেন এবং সেদিন হইতে মেট্রপলিটানের বালকবৃন্দের গৌরবস্থল হইয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার শরীরে বা মনে বিন্দুমাত্র জড়তা ছিল না। সেজন্য যৌবনের সমস্ত উৎসাহ বাহ্যপ্রকৃতির অনুরাগে জ্ঞানস্পৃহায় পরিণত হইয়াছিল। খেলা ও পড়া এই দুইটী তাঁহার যৌবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তবে এসময়ে পড়ার দিকে ঝোঁকটা ছিল কিছু বেশী। সতের বৎসরের শেষ হইতে আর শুধু খেলার ঝোঁকে খেলিতেন না; যে খেলায় শরীর বা মনের উপকার হয় শুধু এরূপ খেলায় যোগ দিতেন এবং বেশীর ভাগ গভীর বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার পর হইতে আমরা তাঁহাকে অধ্যয়নরত ছাত্র দেখি।

কলেজে পাঠকালে তিনি বাহ্য বেশভূষার পারিপাট্য আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। ছাত্রদিগের মধ্যে কাহাকেও 'সৌখীনবাবু' দেখিলে তিনি অনেক সময় তাহার মুখের উপর দু'কথা শুনাইয়া দিতেন,—বিশেষতঃ যদি তাহার বেশে বা ভাবভঙ্গীতে নারীজনোচিত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত।

বি, এ, পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে নরেন্দ্র নিজ বাটীতে বালকদিগের চীৎকার, লোকজনের গণ্ডগোল ও অন্যান্য অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভ মানসে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানেই দিবারাত্রি থাকিতেন, শুধু আহারের সময় দুইবেলা বাটী যাইতেন। মাতামহীর আলয়ে বহির্বাটীর একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে তিনি থাকিতেন। ঘরের সম্মুখে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। অন্দরমহলের সঙ্গে এ অংশের কোন সংস্রব নাই। এই গৃহে বসিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতেন এবং সাধারণতঃ

যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৈনিক পাঠ আয়ত্ত না হইত ততক্ষণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন না। তিনি অনেকদিন পরে একজন বন্ধুর নিকট নিজে এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া গল্প করিয়াছিলেন, "আমি ঘরের ভিতর বই নিয়ে বস্‌তুম, আর পাশেই একটা পাত্রে গরম চা ও কাফি থাক্‌তো, ঘুম পেলেই পায়ে একটা দড়ী বাঁধতুম্, তারপর ঘুমের ঝোঁকে বেহুঁস হ'য়ে পড়্‌লে যেই পায়ের দড়ীতে টান পড়্‌তো অমনি আবার জেগে উঠ্‌তুম।"

কিন্তু পড়াশুনার ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল। বন্ধুবান্ধবরা যাহার যখন ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং একবার তাঁহার তর্ক-যুক্তি বা গান-বাজানা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত "স্বামিজীর স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কালের একটি সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"নরেন্ নিজের এই অপূর্ব্ব ছোট ঘরটীর নাম রাখিয়া ছিলেন 'টঙ'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন 'চল টঙে যাই'। ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটী ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা একটী ক্ষুদ্র বালিশ, মেঝের উপর একটী ছেঁড়া মাদুর পাতা, এক কোণে একটী তাম্বুরা। তাহারই নিকট একটী সেতার ও একটী বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখনও বা ঐ খাটিয়ার নীচে পড়িয়া থাকে, কখনও বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের একপার্শ্বে একটি থেলো হুঁকো, তাহার নিকট তামাকের গুল ও ছাই ঢালিবার সরা, তাহার কাছে তামাক,

টিকে ও দেশালাই রাখিবার একটি মৃত্তিকাপাত্র, আর কুলুঙ্গিতে খাটের উপর, মাদুরের উপর হেথা-সেথা ছড়ান পড়িবার পুস্তক। একটী দেওয়ালে একটি দড়ী খাটান, তাহাতে কাপড়, পিরাণ ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দুটি একটি ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল তাহারই নজীর। নরেন্ মনে করিলেই বাড়ী হইতে পরিষ্কার বালিশ, উত্তম বিছানা ও একটু ভাল ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া, দুই একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়া আপনার ঘরটী বেশ সাজাইতে পারিতেন। করিতেন না যে তাহার একমাত্র কারণ, তাঁহার ওসব দিকে কোন প্রকার খেয়ালই ছিল না। সে জন্য ঘরের সর্ব্বত্র একটা যেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব, প্রকৃত কথা আত্ম-তৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

"নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কোন বন্ধুর আগমন হইল—বেলা তখন এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন 'ভাই রাত্তিরে পড়িস্, এখন দুটো গান গা।' অমনি নরেন পরিবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন, তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন 'তবে বাঁয়াটা নে।' বন্ধু কহিলেন 'ভাই আমিত বাজাতে জানি-নি ইস্কুলে টেবিল চাপ্ড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারবো?' অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন 'বেশ করে দেখে নে দিকি। পারবি বই কি, কেন পারবি নি? কিছু শক্ত কাজ নয়, এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তা হ'লেই হবে।' সঙ্গে সঙ্গে বাজানার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুইবার চেষ্টা করিয়া কোন রকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল। জ্ঞান-

লয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল, টপ্পা, খেয়াল, টপ্‌খেয়াল, খেয়ালধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোল সহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে এক দিনে কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমন কি সুরফাঁক তাল পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজান কার্য্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই। হিন্দি গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব-তরঙ্গের সহিত সুর-লয়ের অপূর্ব্ব ঐক্য দর্শাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল, বাড়ীর চাকর আসিয়া একটী মিট্‌মিটে প্রদীপ দিয়া গেল, ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুইজনের হুঁস হইলে সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"এই প্রকারে নরেনের পাঠে যে কতই ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনি এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন নরেন্দ্র নির্ব্বিকার।

* * * *

"বি, এ, পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দিবার সময় আসিল, সকলেই আপনাপন বেতন ও পরীক্ষার ফি জমা দিল। হরিদাসের (নরেন্দ্রের একজন সহপাঠী) অবস্থা ভাল নয়, তাহার উপর একবৎসর কাল বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয় নাই। তখন এ প্রকার ধারে পড়াশুনা জেনারেল এসেমব্লিতে চলিত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায়

করা হইত। যাহারা নেহাত সমস্ত বেতন দিতে অপারগ তাহাদের কিছু কিছু আবার তেমন তেমন স্থলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত ছাড়ছুড়ের ভার রাজকুমার নামক একজন বৃদ্ধ কেরাণীর উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু আধটু নেশাটা আশটা করেন, কিন্তু গরীব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার দয়ার গুণেই অক্ষম ছাত্রেরা বিনা বেতনই পড়িতে পায়। বেতন সম্বন্ধে রাজকুমারের উপর কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস প্রগাঢ়। রাজকুমার স্বয়ং তদন্ত করিয়া কাহাকেও অর্দ্ধবেতনে কাহাকে বা বিনা বেতনে ভর্ত্তি করেন। রাজকুমার যাহা করেন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাই মঞ্জুর করেন, কাজেই ছাত্রমহলে রাজকুমারের বেজায় প্রতিপত্তি। সকলেই বুড়ো কেরাণীকে বড়ই ভালবাসে, রাজকুমারও ছেলের জহুরী, কে কেমন ছেলে বেশ পাকা রকম জানেন। নরেনের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোন উপায়ে 'ফি'র টাকা যোগাড় করিয়াছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকার কিন্তু যোগাড় করিতে না পারিয়া একদিন নরেন্দ্রকে সে কথা জানাইলেন। নরেন্দ্র কহিলেন 'তুই ভাবিস্‌নি, 'এক্‌জামিনে'র জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে ব'লে সব ঠিক করে দেব, তোর মাহিনাটা মাপ করিয়ে দেব, কেবল ফির্ যোগাড়টা করিস্।'

"বন্ধু উত্তর করিলেন 'ভাই ফির যোগাড় আছে, মাইনেটা মাপ হলে সব গোল মিটে যায়'।

"নরেন কহিলেন 'তবে ভাবনা কি, সব ঠিক হবে এখন।' দুই একদিন পরে তাঁহারা দুইবন্ধু একত্রে কেরাণী রাজকুমারের ঘরের সম্মুখে পদচারণ করিতে করিতে গল্প করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমে রাজকুমার

আসিলেন। অনেক ছেলে একত্র দেখিয়া রাজকুমার একবার সকলের বাকী বকেয়া বেতনের তাগাদা করিলেন, একটু জোর তাগাদা 'অমুক দিনের মধ্যে যে মাইনের টাকা না দেবে এবার তাকে পাঠান হবে না।' ছেলেরা রাজকুমারকে ঘেরিয়া আপন আপন দুঃখ-কাহিনী বলিয়া বকেয়া বেতনের ক্ষমার জন্য আব্দার করিতে লাগিল। কতকগুলি ভাল ছেলে রাজকুমারের প্রিয়পাত্র। অন্য ছেলেদের বিষয় তদন্ত করিতে হইলে রাজকুমার অনেক সময় তাহাদের দ্বারাই করেন। নরেন তাহাদের মধ্যে একজন এবং নরেন্দ্র বেশ জানিতেন যে, তাঁহার উপরোধ রাজকুমার এড়াইতে পারিবেন না। রাজকুমারের মাথায় পাকায় কাঁচায় চুল, গোঁফও তদ্রূপ, কেবল তাহার উপর তামাকের ছোপের দাগ দুইপার্শ্বে; কখন তাঁহার চাপকানের বা জামার বোতাম দেবার অবকাশ হইত না। কাঁধে চাদরখানি জাহাজি কাছির মত পাকান। রাজকুমার যাইয়া আপনার চেয়ারের হাতলে চাদরখানি বাঁধিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন, অমনি ঝন্‌ঝন্ শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারের চারিধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন 'মহাশয়, অমুক দেখ্‌ছি মাইনেটা দিতে পারবে না, তা আপনি একটু অনুগ্রহ ক'রে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাশ হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।'

"রাজকুমার দাঁত মুখ খিচাইয়া 'তোকে জ্যাঠামি ক'রে সুপারিশ করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।' নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিলেন; তাঁহার বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল,

অতীব বিমর্ষ হইয়া নরেনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চলিলেন। নরেন্দ্র অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, বন্ধুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া কহিলেন "তুই হতাস হচ্ছিস্ কেন? ও বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বল্‌ছি তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ। আমি যেমন করে পারি তোর একটা উপায় করব। তোর একজামিন দিতে পেলেই ত হ'ল? ভাবিস্‌নি ভাই, নিশ্চয় বলছি তোর উপায় করবো এই আমার প্রতিজ্ঞা।" বন্ধুর মুখের অন্ধকার ঘুচিয়া পুনরায় তাহাতে আশার আলোক দেখা দিল। বন্ধু ভাবিল নরেন বড় লোকের ছেলে, বাপ উকিল, তাহার গান শিখিবার জন্য বেতন দিয়া ওস্তাদ রাখেন, নরেন হয়ত বাপকে বলিয়াই অক্ষম বন্ধুর কোন উপায় করিয়া লইবেন, তাই তাঁহার প্রত আত্মপ্রত্যয়। রাজকুমার যখন বকেয়া বেতন না দিলে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন না তখন নরেন নিশ্চয় টাকার যোগাড়ই করিবেন। বন্ধু এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্র কলেজ হইতে বাটী আসিয়া হেদোর ধারে একটু আধটু বেড়াইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অন্যদিন সন্ধ্যের পরে আসেন, আজ একটু ব্যস্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিলেন, কিন্তু বাটী না যাইয়া সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হেদোর দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাজারের একটু পশ্চিমে যাইয়া দক্ষিণে একটি গলি, গলির মোড়ের উপরেই একটি বৃহৎ গুলির আড্ডা। ইতিমধ্যে আড্ডায় যাইয়া নরেন আড্ডাধারীর সহিত চুপি চুপি দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আড্ডাধারী বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিল। নরেন আবার হেদোর দিকে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই পার্শ্বের আর একটি গলির ভিতর যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘেরিয়াছে, বেশ গা ঢাকা মত হইয়াছে, এমন সময় গলির সম্মুখে রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত, অমনি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়াই রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। নিজভাব চাপিয়া কহিলেন "কিরে দত্ত, এখানে কেন?"

"নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন "কেন আর কি, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই আমি বেশ জানি হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না, তাকে কিন্তু পাঠাতে হবে নইলে ছাড়ব না। যদি আমার কথাটি না রাখেন ত আমিও ইস্কুলে আপনার কথা রটাব; ইস্কুলে ঢেঁকা দায় করে তুলব। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও বেচারার কেন করবেন না?" স্থির-প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আদর করিয়া নরেন্দ্রের গলদেশে হস্ত জড়াইয়া কহিলেন "বাবা! রাগ কচ্ছিস্ কেন? তুই যা বল্‌ছিস্ তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস্ আমি কি তা করব না?"

"নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন 'তবে কেন সকাল বেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন?"

রাজকুমার। "কি জানিস্, তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো ঐ বায়না ধরবে, তখন কাকে রেখে কাকে দেব বাবা? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়ব। আমায় আড়ালে বলতে হয়, তুই ছেলে মানুষ, ওসব ত বুঝিস্‌নি, কারুর সামনে কি ও কথা বলে? তুই নিশ্চিন্ত হ। মাহিনের টাকাটা মাপ হবে, তবে ফির টাকা ত আর মাপ হয় না, সেটা দেবে ত?"

নরেন। 'সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে এক পয়সা দিতে পারবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে' বলিয়া রাজকুমার আড্ডার আশে পাশে বেড়াইয়া নরেন চলিয়া গেলে আড্ডায় ঢুকিলেন।

"নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখিয়া যাইতে যাইতে মুখে কাপড় চাপিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সহপাঠী বন্ধুটির বাসা নরেন্দ্রনাথের বাসা হইতে বেশী দূর নহে, চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুর বাসায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিয়া গান ধরিলেন—

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল।

অনুপম মহিম পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান
নিরমল পবিত্র উষা কালে।
ভানু নব তাঁর প্রেম-মুখছায়া
দেখ ঐ উদয় গিরি শুভ্রভালে॥
মধু সমীরণ বহিছে আজি শুভদিনে
তাঁর নাম গান করি অমৃত ঢালে,
চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত নিকেতনে
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয় থালে॥

"নরেনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন "ওরে খুব ফূর্ত্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।" এই বলিয়া পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা, রাজকুমারকে ভয় দেখান, ভয়ে তাঁহার কি প্রকার মুখের বিকৃতি হইয়াছিল তাহার নকল, তাহার পর কেমন করিয়া প্রতিদিন এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া ফস্ করিয়া গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করায় সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠিল।

"পরীক্ষার আর বেশী দেরী নাই, বোধ হয় মাসখানেকও নাই, বিপুল কলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাশ হইতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টাই তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না, মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু আধটু পড়াশুনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্ত্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটিতে থাকিতেন তাহার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটি বড় ঘর। এই ঘরের পশ্চিমে একটি চোরকুঠরী বা দোছত্রীর ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর দিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট। তাহার দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র জানালা। এই সময় একদিন প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া 'নরেন' বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁহাকে ঘরের মধ্যে চারিদিক খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন এই চোর-কুঠরীর ভেতর আছি।' সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া হইল, পরে বন্ধু শুনিলেন বিগত দুই দিন ঐ কুঠরীর মধ্যে বসিয়া নরেন ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন, সংকল্প করিয়া বসিয়াছেন যে একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরী হইতে বাহির হইবেন। নরেন্দ্র কার্য্যতঃও তাহাই করিলেন। তিনদিনে ঐ বিপুলকায় পুস্তকখানি পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরীক্ষার দিন আসিল, নরেনের কোন উদ্বেগ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

"আজ পরীক্ষার প্রথম দিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নরেন শয্যা ত্যাগ

করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাশরথির (হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল বাবু দাশরথি সান্যাল) বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়িত। তাঁহাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন ঃ—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব পিতঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ ল'য়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

"নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিলেন। দেখিলেন নরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত বদনে একখানি পুস্তক হস্তে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন। হয়ত একটু পাঠ করিবেন ভাবিয়া বন্ধুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়া যে ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা ছুটাইলেন, তাহার অবরোধ করিয়া পড়াশুনা করা আর সেদিন হইল না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত 'আমরা যে শিশু অতি', 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি' প্রভৃতি গান ও গল্প চলিল। পাশের ঘরে নরেনের অপর একটি সহপাঠী বাস করিতেন। নরেনের গান প্রথম আরম্ভ হইলেই তিনি তথায় আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ শুনিবার পর পরীক্ষার কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি গানের সভা পরিত্যাগ কালে বন্ধুভাবে নরেনকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া

দিলেন, নরেন্দ্র একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু গানের স্রোত থামিল না দেখিয়া বন্ধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'নরেন, একজামিনের দিন কোথায় একটু আধটু খুঁৎ খাঁৎ যা আছে সেটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সকল বিপরীত, বেড়ে ফুর্ত্তি কচ্ছ।'

"নরেন উত্তর করিলেন 'হ্যাঁ তাই ত করছি, মাথাটা সাফ রাখ্ছি, মগজটাকে একটু জিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দুঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাবে সেটা ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই ত নয়। এতদিন পড়ে পড়ে যা হ'ল না তা কি আর দু'এক ঘণ্টায় হয়? হয় না। 'একজামিনে'র দিন সকাল বেলাটা কেবল ফুর্ত্তি, কেবল ফুর্ত্তি করে শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়। ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাই মলাই করে যেমন তাজা করে নিতে হয়, মগজটাকেও তাই করতে হয়।'"

এই কালে নরেন্দ্র কঠোর ব্রহ্মচারীর ন্যায় দিন কাটাইতেন এবং অর্দ্ধেক রাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। চিন্তা ও দর্শনালোচনার ফলে ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ব্রহ্মচর্য্য যে ধর্ম্মজীবনের প্রথম অপরিহার্য্য সোপান ইহা তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত বেদান্তনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যতীত প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। তজ্জন্য এখন হইতে তিনি ব্রহ্মচারীর মত থাকিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তবে অন্যের পক্ষে ব্রহ্মচারী হওয়া বলিলে যেমন অশুদ্ধি বা অপবিত্রতা হইতে বলপূর্ব্বক মনকে ফিরাইয়া শুদ্ধি বা পবিত্রতার দিকে লইয়া যাওয়া বুঝায় তাঁহার পক্ষে ঠিক তাহা বুঝাইত না। আশৈশব তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল সৎ, উচ্চ ও মহৎ। যৌবনারম্ভে শুধু এই প্রবৃত্তি

আরও প্রখর ও বলবতী হইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সৎকার্য্য সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অর্থে পাঠক মন্দের সহিত দ্বন্দ্বে জয়ী হইবার চেষ্টা বুঝিবেন না, কিন্তু ভালর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বুঝিবেন।

এই সময়ে তিনি পরিব্রাজক সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলে সাদরে তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া গান শুনিতেন বা গল্পগুজব করিতেন। মাতুলালয়ে অবস্থানকালে সামাজিক বা অন্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে সে বিষয়ের আলোচনায় নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। বয়স্যেরা তাঁহার সে ভাব দেখিয়া বলিত "ওঃ নরেন তুমি ভাই অদ্ভুত ছেলে, তোমার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই খুব উজ্জ্বল!"

তাঁহার চরিত্রে দুইটি অসমঞ্জস প্রকৃতি অতি সুসমঞ্জসরূপে পরস্পর বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিত—একটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব, অপরটি আনন্দের শুদ্ধবিগ্রহরূপে জগৎরস আস্বাদনের ভাব। পর-বৈরাগ্যের জ্বলন্তমূর্ত্তি ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনের প্রথমে এইরূপে গড়িয়া উঠিতেছিলেন। অদ্বৈতের একনিষ্ঠ প্রচারক হইয়াও যিনি ব্যবহারিক জীবনে কর্ম্মশীলতা ত্যাগ করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই এবং জগৎ প্রকৃতপক্ষে শূন্য হইলেও যিনি অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানুভূতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎকে শূন্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছেন তিনি যৌবনারম্ভে গৃহস্থাশ্রমে জীবনটাকে কত মধুর ভাবে ভোগ করিতে পারা যায় তাহা দেখাইয়াছিলেন। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট জগৎসত্তা না থাকিতে পারে, কিন্তু আর সকলের নিকট ত আছে, সুতরাং জগৎটা ভোগের বস্তু; কিন্তু ইহা অজ্ঞানীর ভোগ নহে, স্বার্থ-বিজড়িত উদ্দাম লালসার তাড়নায়

হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া ভোগের পশ্চাতে উন্মত্তবৎ দৌড়ান ও প্রতি পদে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হওয়া নয়, এ ভোগ প্রকৃত সম্ভোগ—স্বার্থের লেশ মাত্র নাই, মলিন বাসনার ছায়াসম্পর্কশূন্য, বিশুদ্ধ প্রেমের পরিপূর্ণ আনন্দের বিচিত্র লীলা বিলাস। অন্তরে বৈরাগ্যের দীপ্তহুতাশন, সুতরাং আসক্তি নাই। আসক্তি নাই—কিন্তু আনন্দ আছে। 'পিউরিট্যান'দের (Puritan) মত জোর করিয়া মনকে ভোগ্য-বিমুখ করিবার চেষ্টায় প্রাণে নিরানন্দের সৃষ্টি নাই, প্রতিহত বিষয়বাসনার নির্ম্মম দংশনে বিষজ্জ্বালার উৎপত্তি নাই, পরন্তু সহজ সরল নিষ্কামভোগে পূর্ণ পরিতৃপ্তি, পরম শান্তি ও অজস্র আনন্দ আছে।

জগৎকে এইরূপ নিষ্কামভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়াই বাটীতে অসংখ্য দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি প্রায়ই দরিদ্র বন্ধুবান্ধবদিগের গৃহের দৈন্য অভাব ও নিরাশার ম্লানচ্ছবির মধ্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ইহাদের সংসর্গে তাঁহার যে আনন্দ হইত প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও তিনি সে আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেন না।

এই সময়ে 'স্পেন্সারে'র দর্শনালোচনা তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ঐ মতবাদের কোন কোন প্রসঙ্গের সমালোচনা করিয়া 'হার্বার্ট স্পেন্সার'কে পত্রও লিখিয়াছিলেন। দার্শনিকপ্রবর তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা ও সাধুবাদ করিয়া একটী উৎসাহপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শুনা যায় নাকি গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণে তাঁহার সমালোচনানুযায়ী নিজমতের কতক কতক পরিবর্ত্তন করিবেন এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। স্পেন্সারের মত লোক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করাতে নরেন্দ্রের উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। অন্ততঃ তিনি বুঝিলেন যে চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহার

কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন না। কথাটার মূল্য আছে। সে সময়ে 'রেভারেণ্ড হেষ্টি' (Rev. W. W. Hastie) সাহেব জেনারেল এসেমাব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তখন কেহই পাণ্ডিত্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট দর্শন-শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি সুপ্রসিদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ও উক্ত হেষ্টী সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রের এক ক্লাস উপরে পড়িতেন। এই হেষ্টী সাহেব বলিয়াছিলেন :—"Narendra Nath Dutta is really a genius! I have travelled far and wide, but I have never yet come across a lad of his talents and possibilities, even in the German Universities, amongst philosophical students. He is bound to make a mark in life." (নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান্ বালক। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু এমন একটী ছাত্র আর দেখি নাই, এমন কি জর্ম্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রদিগের মধ্যেও নহে। এ বালক নিশ্চয়ই জগতে একটা নাম রাখিয়া যাইবে।) নরেন্দ্র নিজেও বিশ্বাস করিতেন কোন মহৎকার্য্য সম্পাদনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছে।

বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্যান ও প্রার্থনা করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য 'স্পেনসার' প্রমুখ পণ্ডিতগণের বিচারপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থের সহিত 'ঈশানুসরণ' ('Imitation of Christ') নামক ভক্তিগ্রন্থও তিনি আদরের সহিত পাঠ করিতেন।

তাঁহার ইংরাজী জীবনীলেখকগণের এই উক্তি বাস্তবিক সত্য—নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক যুবকগণের মধ্যে একজন অদ্ভুত

যুবক ছিলেন—দুষ্টামীতে বালক, সঙ্গীতে ওস্তাদ, বিদ্যাবুদ্ধিতে পণ্ডিত, এবং সাংসারিক ব্যাপারে চিন্তাশীল দার্শনিক—এমন একটী ছেলে আর কোথাও পাওয়া যাইত না।

মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা।

কলেজে পাঠকালে নরেন্দ্র যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহার মনে অজ্ঞেয়বাদ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের ছায়া পতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'স্পেন্সারে'র গ্রন্থাবলী তাঁহার মনের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎপ্রণীত "মুলতত্ত্ব বিজ্ঞান" (The Science of the First Principles) নামক গ্রন্থখানি ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে [illegible]ই প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করে। সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া নরেন্দ্রের বহুদিনের ধর্ম্মবিশ্বাস কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া গেল। কিন্তু তিনি নিজে অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন, বিনা যুক্তিতে কোন বিষয় বিশ্বাস বা গ্রাহ্য করিতেন না। যতক্ষণ সে বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইত ততক্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিতেন না, বরং নিজের চিন্তারাশির মধ্যে সযত্নে একস্থানে রক্ষা করিতেন। এখন হইতে তিনি পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও তাঁহাদের প্রাধান্যে আস্থাশূন্য হইলেন। দেখিলেন যে তাঁহাদের প্রভুত্ব ও জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস সমগ্র জাতির ধর্ম্মজীবন বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং তিনি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 'স্পেন্সারে'র যুক্তি তিনি অকাট্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিলেন এবং সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার উপর নির্ভর না করিলেও অনেকটা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলেন। 'হেগেল', 'শোপেনহয়ার' এবং 'মিল'কেও তিনি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার জীবনের পরিচালক বলিয়া মনে

করিতেন, কিন্তু 'স্পেন্সার'কেই সর্ব্বাপেক্ষা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান এবং পুরোহিত দিগের সঙ্কীর্ণতা ও প্রতারণায় বিরক্তচিত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সাধারণ নীতিকে অতিক্রম করা যে পাপ ও সর্ব্বতোভাবে অন্যায় ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে তিনি 'অগস্ত কোমতে'র দর্শনের (Positivism) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ব্যবহারিক জীবনে উহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বোধে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অজ্ঞেয়বাদ অধিক দিন তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারিল না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতই কেহ স্রষ্টা নাই বা থাকিলেও তাঁহাকে জানা যায় না, ইহা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই বিদ্রোহী মন তাঁহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। তিনি যতই বিচার করিতে লাগিলেন ততই ঘোরতর সন্দেহান্ধকার তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আরও প্রচণ্ড ভাবে ঘিরিতে লাগিল। তিনি মনোমধ্যে বিষম যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কোনদিকে সত্যের ক্ষীণতম আভাসমাত্রও না পাইয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নৈতিক জীবনের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হইল না। তাঁহার আবাল্য বিশ্বাস, গৃহের শিক্ষা ও জীবনযাপন-প্রণালী তাঁহাকে এই সত্যের দিক্ হইতে কিছুতেই বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে তাঁহার মনের এইরূপ ভাব হইয়াছিল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে যতই গভীর সন্দেহ হউক না কেন, সেই ছলে ব্যবহারিক জীবনের বিশুদ্ধতা নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেরই উচিত নহে। মানুষের বিচার-শক্তি যতই অগ্রসর হউক না তাহার একটা সীমা আছে, অনেক বিষয় জানিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সুতরাং হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত

করিয়া তাহার স্থলে তিনি শুদ্ধ বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন না। হৃদয় যাহা উচিত বা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছিল, কেবল বুদ্ধি বা বিচারের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই দিক অনুসরণ করিতেছিলেন। হৃদয়ের প্রেরণাতেই তিনি কঠোর ত্যাগীর জীবন যাপন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বিধবার ন্যায় শুভ্রবস্ত্র পরিধান ও ভূশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। মনের মধ্যে যে ত্যাগের ভার বন্যাস্রোতের মত হু হু করিয়া আসিতে লাগিল তাহাকে রোধ করা আবশ্যক মনে করিলেন না,—বরং জীবনের পূর্ণ পরিণতির জন্য তাহার সম্যক্ উপযোগিতা আছে বলিয়া অনুভব করিলেন।

এদিকে কিন্তু বাটীর লোকেরা তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পিতামাতা সকলেরই ইচ্ছা যে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যতবারই তাঁহারা স্বামীজির বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছেন, ততবারই একটা না একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শেষ বারে তাঁহার পিতা মানবলীলা সংবরণ করেন। সেটা তাঁহার বি, এ, পরীক্ষা দিবার অল্পদিন পরেই ঘটে। পরিবার মধ্যে তাঁহার বিবাহ লইয়া এত উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের এদিকে কোন খেয়ালই ছিল না।* তিনি দর্শনশাস্ত্র

---

* তাঁহার পিতামাতার ইচ্ছা ছিল বিবাহের পর তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবেন ও সেখানে তিনি 'সিভিল সার্ভিস' কিংবা 'ব্যারিষ্টারী' পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন। কলেজে পড়িবার সময় নরেন্দ্রের মনেও 'বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস দিব' এইরূপ একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মত হয় নাই; কারণ পরমহংসদেব তাঁহার বিবাহের বিরোধী ছিলেন ও ঐ কথা শুনিয়া কালীমাতার

আলোচনা ও চিন্তার ফলে ঐহিক ভোগ-সুখটাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ তাঁহাকে আর কিছু শিক্ষা দিক্ বা নাই দিক্ জীবনটা যে স্বপ্নবৎ অস্থায়ী ও অলীক এবং জগতের তাবৎ পদার্থই নিরর্থক, এইটুকু বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিল। এই অসার স্বপ্নসম জীবনের মধ্যে সত্যকে লাভ করাই ইহার চরম সার্থকতা এইটি স্থির করিয়া তিনি ক্রমাগত বিচারের সাহায্যে তাহারই নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাকে প্রতিপদে অবিশ্বাসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা জিনিষ সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ না হইতেছিল ততক্ষণ তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু প্রমাণের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিরত ছিলেন না। নিজের ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা তিনি অনেকটা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি বেশ জানিতেন এতটা চেষ্টা ও সংগ্রাম বিফলে যাইবে না, এমন দিন আসিবে যেদিন তিনি যাহা চাহিতেছিলেন তাহা লাভ হইবে এবং সন্দেহ ও অজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তিনি দীপ্ত সত্যের সম্মুখে অবস্থান করিবেন। কিন্তু এত সন্দেহ ও বিচারের মধ্যেও তিনি পূর্ব্বাভ্যস্ত ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করেন নাই। ধ্যান যখন জমিয়া আসিত তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্তর্লীন অবস্থায় থাকিতেন, সেখানে আর সন্দেহ বা অবিশ্বাসের প্রবেশাধিকার ছিল না। ঐ সময়টা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, কারণ এ আর চিন্তা বা কল্পনা মাত্র নহে, কিন্তু প্রকৃতই একটা অনুভূতি

নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'মা ওর বিয়ে টিয়ে ঘুরিয়ে দে।' নরেন্দ্রও সেই হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন কিছুতেই বিবাহ করিবেন না, এবং পিতার ভৎর্সনায় ও গৃহবহিষ্কৃত হইবার ভয় প্রদর্শনেও কোন ফল হয় নাই।

বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি। নরেন্দ্র-চরিত্রে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সংশয়াকুল চিত্ত দুইটী পাশাপাশি অবস্থিতি করিত। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। সন্দেহবাদীদের ন্যায় তিনি অন্ধকারের মধ্যে আপনার পথ হারাইয়া ফেলেন নাই। অন্ধকারেও আলোর আশায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল সত্যলাভের প্রতিজ্ঞা ততই তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদে অনুসন্ধিৎসু মন অধিক দিন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। নরেন্দ্রও পারিলেন না। 'জ্ঞানের সীমা এতদূর পর্য্যন্ত, এর বেশী আর জানিবার উপায় নাই' এভাবে বেশী দিন চলিল না। যদিও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সন্দেহ ও বিচারের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া প্রায় প্রাণ হারাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তথাপি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের মাঝখানে একদিন তাহা কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং অজ্ঞেয়বাদকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার স্থানে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানময় ও প্রেমময় ঈশ্বরকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিল। সেদিন হইতে তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস হইল যে, ঈশ্বর প্রকৃতই আছেন, যদিও আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না। সেদিন হইতে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা আসিয়া তাঁহার মস্তককে সহজেই সেই উপাস্য ঈশ্বরের চরণোদ্দেশে অবনত করিয়া দিল। সেদিন হইতে তিনি তাঁহাদের বাটীর পূজার দালানে সঙ্গীদিগের নিকট কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনের পিপাসা মিটিতেছিল না। তিনি এমন একজন প্রাণের দোসর খুঁজিতেছিলেন যিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে অভীপ্সিত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু এরূপ কেহই জুটিল না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যেমন করিয়াই হউক

ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সেইজন্য এমন একজনকে খুঁজিতে লাগিলেন যিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাকেও দর্শন করাইয়া দিতে পারিবেন। ভক্তের ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া একদিন তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিতের সহিত মিলন করাইয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাঠক দেখিবেন সহজে বা শীঘ্রই তাহা হয় নাই। মস্তকে অশেষ চিন্তাভার ও হৃদয়ে বিপুল বেদনার বোঝা লইয়া তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল এবং ধৈর্য্যের সহিত অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল—তবে সে বাঞ্ছিতের দর্শন পাইয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যেদিন যেদিন তাঁহাদের উপাসনা বা বক্তৃতা থাকিত সেদিনই তিনি উপস্থিত হইতেন এবং শীঘ্রই রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী ও ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেন। সে সময়ে বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন নব্যবঙ্গের নেতা। কেশব বাবুর অনেক ভক্ত। তাঁহার গভীর ভাব, ধর্ম্মোৎসাহ ও আকর্ষণী শক্তিতে নরেন্দ্র মুগ্ধ হইলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত—তিনিও যেন কালে কেশববাবুর মত হইতে পারেন। এক হিসাবে তাঁহার এ বাসনা পূর্ণও হইয়াছিল। উত্তরকালে তিনিও বক্তৃতাকুশল লোকশিক্ষক বলিয়া কেশববাবুর ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, কেশববাবুর ন্যায় প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি নূতন কিছুর প্রতিষ্ঠা করেন নাই, বরং স্বীয় মতকে পুরাতনেরই অভিব্যক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

পুরাতন কঙ্কালসার সমাজের অত্যাচারে ব্যথিতচিত্ত নরেন্দ্রনাথ কতকগুলি বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের সহিত একমত হইলেন। জাতি-ভেদের

দৌরাত্ম্য ও স্ত্রীজাতির শিক্ষাহীনতা তাঁহার চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিলেন। তাঁহার মাতা ধীরভাবে সব শ্রবণ করিলেন কিন্তু পুত্রের সত্যপ্রিয়তা ও অকপটতার উপর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলিয়া মুখে কিছু বলিলেন না, মনে করিলেন কালে তিনি আপনিও ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হইবেন।

নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমে রীতিমত খাতায় নাম লিখাইয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন। এমন কি, যখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন তখনও হয়ত ব্রাহ্মদিগের খাতায় তাঁহার নাম ছিল। কিন্তু তখন তাঁহার আদর্শ ব্রাহ্ম-আদর্শের বহু উপরে উঠিয়াছে এবং সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনা ব্রাহ্মসমাজবদ্ধ সংস্কার অপেক্ষা আরও আমূল পরিবর্ত্তনের সংকল্প গঠিত করিয়াছে। কিন্তু এই সংস্কারের পথ ও উপায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার মতের বিস্তর ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে বিনাশমূলক সংস্কার অপেক্ষা গঠনমূলক সংস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত সংস্কার করিতে হইলে বাহিরের আঘাতে জন-সাধারণের দীর্ঘকালের বিশ্বাস ও ধারণার উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তাহাকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত না করিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে শিক্ষিত, মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া অন্তরের মধ্য হইতে স্বতঃই সেই সংস্কার প্রবৃত্তিকে জাগাইতে হইবে, নতুবা কৃতকার্য্যতার আশা বড় কম। পুরুষপরম্পরাগত রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে নিন্দা বা অবজ্ঞা না করিয়া যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে ও মন্দ ভাগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিদেশীয় ভাব বা বিজাতীয় আদর্শের পশ্চাতে দৌড়াইলে বা তাহাদের যাহা শ্রেয় ও প্রেয় তাহাকেই

অন্ধের ন্যায় আমাদিগেরও একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় বোধে গ্রহণ করিলে হিতে বিপরীত হইবে মাত্র, আর কিছু লাভ হইবে না। পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের অন্ধ-অনুকরণ প্রকৃত সংস্কার নহে, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে পুরাতনের উপর যে নবরশ্মি পতিত হইতেছে তাহার সাহায্যে পুরাতনের সারাংশকে চিনিয়া, বাছিয়া ও নূতনের সহিত তাহাকে কতকটা মিলাইয়া কর্ম্মজীবনে আপনাদের হৃদয় ও মনের অংশীভূত করিয়া লওয়াই প্রকৃত সংস্কার।

নরেন্দ্র গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভারতের অনেক সমস্যাই তখন তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ হিন্দুধর্ম্মের প্রসার সাধন করিয়া তাহার মধ্যে জাতীয়ভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলাই এখন তাঁহার প্রধান ধ্যেয় বস্তু হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া নরেন্দ্র সমবয়স্ক বয়স্যগণের নিকট অগ্নিময়ী ভাষায় বিশৃঙ্খল ও অবনত হিন্দুসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরে তিনি কখনও নিজেকে হিন্দু ব্যতীত আর কিছু মনে করিতেন না। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাব হিন্দু বলিয়া বিবেচনা করিতেন,—তবে সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না।

অকূল চিন্তাসাগরে আশ্রয়।

প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়া নরেন্দ্র কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই কেশববাবুর ন্যায় প্রচারক হইবার বলবতী বাসনা উদিত হইত। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেক চরিত্রবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াও তিনি বেশ প্রীতি লাভ করিতেন। দিন কতকের জন্য মনটা যেন শান্ত হইল, কিন্তু তাহার পর আবার পূর্ব্ববৎ অশান্তি আরম্ভ হইল। কেবলই ভাবিতে লাগিলেন—কৈ, ঈশ্বরের দর্শনলাভ হইল কৈ? ব্রাহ্ম-সমাজে যখন তিনি গান গাহিতেন তখন ক্ষণিকের জন্য প্রাণে ভগবৎ-রসের আস্বাদ পাইতেন, কিন্তু সেও ক্ষণিক। সুতরাং তিনি আবার একান্তচিত্তে আলোকের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রাণের উৎকণ্ঠায় তিনি একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তখনকার শিক্ষিত লোকদিগের নিকট একজন উচ্চ-শ্রেণীর ধর্ম্মশিক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি শান্তি ও সত্যকামনায় কতকটা ত্যাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিলেন এবং সদাসর্ব্বদা প্রায় ধ্যান ধারণাতেই অতিবাহিত করিতেন। তিনিই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বহির্বিকাশ সাধন করেন। সুতরাং নরেন্দ্র মনে করিলেন তাঁহার নিকট যাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মহর্ষি তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া গভীর ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। শীঘ্রই একটি ক্ষুদ্র দল সংগঠিত হইল, সেখানে মহর্ষি প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণের জন্য ধ্যানাভ্যাস প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে কে কেমন উপলব্ধি করিতেছে

তাহার পরিচয় লওয়া হইত। নরেন্দ্র উপলব্ধি করিতেন যেন একটা জ্যোতিবিন্দু ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। তারপর যেন সেই জ্যোতির্মধ্য হইতে নানাবিধ অসংখ্য উজ্জ্বল রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। তারপর তাঁহার জ্ঞান যেন সাধারণ সসীম ক্ষেত্র ছাড়িয়া এক অজ্ঞেয় অসীম রাজ্যের মধ্যে গিয়া পড়ে, কিন্তু ঠিক এই স্থানে আসিলেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত এবং সেই আলোক-রশ্মি-উদ্ভাসিত বর্ণমালা অন্তর্হিত হইত। মহর্ষি বুঝিলেন এ যুবকটি সাধারণ যুবক-সম্প্রদায় হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং নিজে যতদুর পারিলেন এ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এমন কি অপরের নিকট তাঁহাকে একজন অসাধারণ সুপ্ত-শক্তিমান্ যুবক বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। নরেন্দ্র একান্ত শ্রদ্ধাসমন্বিত চিত্তে প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাতায়াত ও তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিতে লাগি-লেন। কিন্তু তথাপি তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না—শান্তি মিলিল না।

একদিন তিনি মহর্ষির গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকা মধ্যে গমন করিয়া, দ্রুতগতি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি তখন উপাসনা করিতে-ছিলেন। নরেন্দ্র কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন "মহাশয় আপনি কি স্বয়ং ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" সহসা এই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অপূর্ব্ব প্রশ্নে মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন। একবার—দুইবার—তিনবার তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তিনি ক্ষণকাল নরেন্দ্রের নেত্রমধ্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বৎস! তোমার চক্ষুদ্বয় ঠিক যোগী-দিগের চক্ষের ন্যায়!"

ইহার পর কিছুদিন গেল, কিন্তু নরেন্দ্রের চিত্তের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহর্ষির উত্তরে তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি ত ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন একথা বলেন নাই,—কি করিয়া এখন ঈশ্বর লাভ করা যায়? তিনি জানিতেন যে, দর্শনাদি শাস্ত্র অতি তুচ্ছ। তাহারা শুধু ভগবানকে বুঝিবার একটুকু ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র। পুস্তকের মধ্যে ভগবদ্দর্শন লাভ অসম্ভব, তবে কি করা যায়? তখন তাঁহার মনে হইল পরমহংসদেবের কথা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি প্রথম পরহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে পরমহংসদেবের এক শিষ্য একদিন স্বকীয় সিমুলিয়ার বাসভবনে পরমহংসদেবকে আনয়ন করিয়া একটি ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে একজন সুগায়কের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি আর কাহাকেও না পাইয়া প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রকে সাদরে নিজালয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। ঐ দিবস নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হ'ন ও ভজনাদি সাঙ্গ হইলে সুরেন্দ্রবাবু এবং রামচন্দ্র দত্তের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং এক দিবস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বর যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে যখন তাঁহার পিতা এক ধনাঢ্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিতেছিলেন এবং কন্যার পিতা দশসহস্র মুদ্রার পরিবর্ত্তে ঈদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতারত্ন লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন, সেই সময়ে নরেন্দ্রকে উক্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত দেখিয়া ও তাঁহার আন্তরিক ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদেরই এক আত্মীয় ও তাঁহার পিতৃ অন্নে লালিত

'রামদাদা' (ভক্ত ৺রামচন্দ্র দত্ত) তাঁহাকে বলেন 'ভাই তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন ? যদি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ও ঈশ্বরলাভ করিতে চাও তবে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট যাও।' তাহার পর একদিন জন দুই তিন বয়স্য সমভিব্যাহারে নরেন্দ্র উপরোক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। ঠাকুরকে দেখিতে এই তাঁহার প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গমন ও ঠাকুরের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ।* এদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে গান গাহিতে বলায় তিনি তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মসমাজাদৃত 'মন চল নিজ নিকে-তনে' এই গানটি গাহিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। গাহিবার পর ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন ও ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া দর-বিগলিতধারে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে যেন বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আস্‌তে হয় ? আমি যে তোর পথ চেয়ে হাঁ করে বসে আছি তা কি একটিবারও মনে কর্ত্তে নেই ? বিষয়ী লোকেদের সঙ্গে কথা ক'য়ে কয়ে আমার যে ঠোঁট পুড়ে যাবার মত হয়েছে !' এই সব বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই আবার কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন 'প্রভু আমি জানি তুমি কে। তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নরনারায়ণ, জীবের

* শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকার বলেন এইটী দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার (উদ্বোধন—আশ্বিন, ১৩২২) কিন্তু কথামৃতকার বলেন ইহাই স্বামিজীর পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন (কথামৃত ৩য় ভাগ, প্রথম সংস্করণ ২৮৬ পৃঃ)। কথামৃতকারের মতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে দর্শনের পর রাজমোহনের বাড়ীতে দ্বিতীয় দর্শন হয়। (কথামৃত ৩য় ভাগ ২৮৭ পৃঃ)

দুর্গতি নিবারণের জন্যই তোমার শরীর ধারণ হইয়াছে ইত্যাদি।'* স্বামিজী ঠাকুরের মুখে এবম্প্রকার কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে একপ্রকার উন্মাদ (monomaniac) বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং বেশী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন মাত্র। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে স্বহস্তে মাখন মিছরী ও সন্দেশ খাওয়াইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া একত্রে খাইবার কথা বলিলে ঠাকুর বলিলেন 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাওনা' ও সবটুকু তাঁহাকে খাওয়াইয়া ছাড়িলেন। তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন 'বল্ শীঘ্র আর একদিন একলা আমার কাছে আস্‌বি?' তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নরেন্দ্র 'আসিব' বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েন।

বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত আচরণ ও ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদবৎ অবস্থার কথা যদিও কয়েকদিন বারংবার তাঁহার মনে হইয়াছিল তথাপি কার্য্যগতিকে আর উক্ত অঙ্গীকার পালনের সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু মাসাধিক কাল পরে আবার একদিন তিনি একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখিতে যান। ঠাকুর সেদিনও পূর্ব্বদিনকার মত ছোট তক্তপোষখানির উপর বসিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে হাত ধরিয়া তক্তপোষেরই একধারে বসাইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া অস্ফুটস্বরে কি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী ভাবিলেন পাগল বোধ হয় আবার কোন পাগলামি করিবে। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন ইত্যবসরে ঠাকুর সহসা তাঁহার দক্ষিণ পদ দিয়া নরেন্দ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ-

---

* লীলাপ্রসঙ্গপ্রণেতা বলেন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই পরমহংসদেব স্বামীজিকে এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কথামৃত ৩য় ভাগের (প্রথম সংস্করণ) ২৮৭ পৃষ্ঠায় আছে প্রথম দিন নয় কিন্তু অন্য আর একদিন।

মাত্রই নরেন্দ্রের বোধ হইল গৃহের ভিত্তিসমূহ ও চতুর্দ্দিককার জিনিষ পত্র, গাছ পালা, চন্দ্র সূর্য্য সব যেন সবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে লয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার অস্তিত্বকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তিনি হঠাৎ দারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু-সম্ভাবনায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন 'ওগো তুমি আমায় এ কি কর্‌লে, আমার যে বাপ মা আছেন!' এতচ্ছ্রবণে ঠাকুর প্রথমে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন পরে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন 'তবে এখন থাক, তাড়াতাড়িতে কাজ নেই, সময়ে হবে।' কিঞ্চিৎ পরে স্বামীজি প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু সেদিনের ঘটনায় তাঁহার ধারণা হইল ঠাকুর সম্ভবতঃ খুব ভাল 'হিপ্‌নটিজম' (Hypnotism) বা 'মেসমেরিজম' (Mesmerism) জানেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণমস্তিষ্ক লোকেরাই ত ঐরূপে বশ হয় এবং চিরদিন নিজের মানসিক দৃঢ়তার উপর বিশ্বাস থাকায় ব্যাপারটা কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় সপ্তাহকাল পরে নরেন্দ্র পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তখন ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার ভাব তাঁহার মধ্যে খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন রাসমণির বাগানে জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী যতুমল্লিকের বাগানে প্রবেশ করিলেন, এবং উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমন করিয়া উদ্যানমধ্যস্থ একটি গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও কিঞ্চিৎ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র ধীর-ভাবে উক্ত অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্ব্বদিনের মত হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন সত্বেও নরেন্দ্র ঐ স্পর্শে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিলেন

না। তবে এদিনে পূর্ব্বদিনের ন্যায় না হইয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা লাভ হইলে দেখিলেন ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

লীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, ঐ দিন নরেন্দ্রের বাহ্য সংজ্ঞা লোপ হইলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কে সে—কোথা হইতে আসিয়াছে—কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে) কত দিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। নরেন্দ্রও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। তাহা হইতে ঠাকুর জানিতে পারেন যে তিনি নরেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলেন সেগুলি সব সত্য এবং তিনি (নরেন্দ্র) প্রকৃতই যাহা—যেদিন তাহা জানিতে পারিবেন, সেদিন আর দেহ রাখিবেন না,—সংকল্প দ্বারা যোগমার্গে দেহত্যাগ করিবেন। তিনি নরেন্দ্রকে 'ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এইরূপে অষ্টাদশবর্ষ বয়সের সময় হইতে স্বামীজি পরমহংসদেবের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন কিন্তু তখনও তিনি সেই অলোকসামান্য মহাপুরুষের অদ্ভুত চরিত্র সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন নাই। কখনও মনে করিতেন, তিনি উন্মাদ—ঈশ্বরের ভাবনা ভাবিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কখনও ভাবিতেন, না, ইনি সত্যই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ,—কিন্তু ঠিক তাঁকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি নিজের আন্তরিক ধর্ম্মপিপাসা-শান্তি-মানসে ব্রাহ্মসমাজে ও অন্যান্য স্থানে মিশিতেন বটে, কিন্তু যখন কিছুতেই সত্যনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, যখন বুঝিলেন এমন কি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন পরমহংসদেবকে

এ সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন। মনে ভয় হইতে লাগিল পাছে তিনিও বলেন 'না, আমারও ঈশ্বর দর্শন হয় নাই।'

একদিন তিনি ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন এবং পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি না। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন 'হাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখ্‌ছি।' পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে শুধু তিনি নিজে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহাকেও দেখাইয়া দিতে পারেন বলিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত রূপদর্শন হইত প্রথম প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত বাহ্যযুক্তিমাত্রসহায় নরেন্দ্রনাথ তাহাদের বাস্তবসত্তায় সন্দিহান হইয়া ঐ সকল দর্শনের বিষয় হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি পরমহংসদেবের প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও অমৃতময় উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ প্রসারতা লাভ করিতেছিল এবং অনেক অন্তঃসংগ্রাম ও তর্ক বিরোধের পর অবশেষে তিনি পরমহংসদেবের সকল কথা সত্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দু' একদিনে হয় নাই, তিনি দীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল ধরিয়া প্রতিপদে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন ও সম্পূর্ণ প্রমাণ সহায়ে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও তাঁহার প্রতি সন্দেহ ত্যাগ করেন নাই।

পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট।

ইতিমধ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক বিষম পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার পিতা বিশ্বনাথবাবু পরলোক গমন করেন। তখন নরেন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। সবে বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন। পরীক্ষার দিনকতক পরে একদিন তিনি বরাহনগরের বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত গান বাজনা করিয়া আহারাদির পর সকলে একগৃহে শয়ন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে, হৃদ্‌রোগে বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদে নরেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও শোককাতর হৃদয়ে যথাবিধি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিলেন।

তারপর বড় কষ্ট আরম্ভ হইল। অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিলেও মুক্তহস্ত বিশ্বনাথবাবু বড় কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং কিঞ্চিৎ ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর সংসার চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। শোকাতুর নরেন্দ্রনাথ ভগ্ন-হৃদয়া জননীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন ও বলিলেন সব ঠিক হইয়া যাইবে। মাতা দুঃখের মধ্যে পুত্রের হৃদয়ের বল দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কয়েক সপ্তাহ একরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু তারপর প্রকৃতই অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল। নরেন্দ্র তখন বি, এল, পড়িতেছিলেন। অর্থাভাবে দীন-দরিদ্রের বেশে কলেজে যাইতেন। দূর দূরান্তরে যাইতে হইলেও কখন পদব্রজে ব্যতীত গাড়ীতে যাইতেন না। যে সকল গাড়োয়ানেরা

পূর্ব্বে তাঁহার নিকট অনেক বখ্‌শিশ পাইয়াছে তাহারা এখন তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া কখন কখন তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া বিনা ভাড়ায় তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, কিন্তু তিনি এই সকল সুযোগ গ্রহণ করিতেন না। সে সব দিন যে কি অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা তিনি ও তাঁহার মাতাই জানিতেন। বাহিরের লোকে তাহার শতাংশের একাংশও টের পায় নাই। *

---

* স্বামীর মৃত্যুর পর দারিদ্র্যে পতিত হইয়া ভুবনেশ্বরী দেবীর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশটাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষণ্ণ দেখা যাইত না। ঐ স্বল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক ব্যয় অনেক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসার নির্ব্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই অথচ তাঁহার সুখ-পালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্র সকলের ভরণপোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে—তাঁহার পতির সহায়ে যে সকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া তাঁহারা ন্যায্য অধিকার সকলেরও লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প—তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্ম্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—এইরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীর স্থিরভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া ছলেন তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তিশ্রদ্ধার স্বতঃই উদয় হয়।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ)

কয়েকমাস পরে পাদুকা ব্যবহারও তাঁহার পক্ষে যেন একটা বিলাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়াইল। পরণে মোটা গুণচটের মত কাপড়, উদরে অন্ন নাই, সমস্তদিন মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অনাহারে নগ্নপদে চাকরীর চেষ্টায় দরখাস্ত হাতে অফিসে অফিসে ঘুরিতে হইয়াছে। কখনও কাহারও নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই, বরং পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পাইলে জীবন ধন্যজ্ঞান করিয়াছে, তাহারাও এখন অনেকে তাঁহার দুঃসময় দেখিয়া মুখ বাঁকাইতে লাগিল বা ক্ষমতা সত্বেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইল। দেখিয়া শুনিয়া সংসারটা তাঁহার নিকট আসুরিক সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইত।

সারদানন্দ স্বামী বলেন—এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং তিনি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐস্থানে দুই একজন বন্ধু আসিয়া জুটিল ও তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য 'বহিছে কৃপাঘন নিঃশ্বাস পবনে' এই গানটি গাহিতে লাগিল। স্বামিজী বলিতেন "শুনিয়া মনে হইয়াছিল যেন সে মাথায় গুরুতর আঘাত করিতেছে। বাটীতে বুভুক্ষিত জননী ও ভাই ভগিনীদের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় ক্ষোভে, অভিমানে ও নৈরাশ্যব্যঞ্জকস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলাম 'নে নে চুপ কর্, ক্ষুধার তাড়নায় যাদের মা ভাইকে কষ্ট পাইতে হয় না, দৈন্য অভাব যে কি তাহা যাহারা কখনও টের পায়নি, টানা পাখার তলায় বসিয়া এসব কল্পনা তাদের ভাল লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কিন্তু কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'" বন্ধুটি বোধ হয় তাঁহার কথায়

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ দিয়া ঐ সকল কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন! নরেন্দ্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিতেন গৃহে খাদ্যদ্রব্য কি আছে না আছে। যেদিন বুঝিতেন অনাটন, অথচ হস্তে অর্থ নাই, সেদিন মাতাকে "আমার নিমন্ত্রণ আছে" বলিয়া বাহির হইতেন, বা নিজে সামান্য কিছু খাইয়া অধিকাংশ অপরের জন্য রাখিয়া দিতেন, কোন কোন দিন বা একেবারে উপবাসে কাটাইতেন।

কিন্তু এত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও নরেন্দ্র হৃদয়ের বল হারান নাই বা বাহিরে কোনরূপ দুর্ব্বলতার চিহ্ন ব্যক্ত হইতে দেন নাই। ভিতরে যতই দৈন্য থাকুক না কেন, বাহিরের লোকে তাহা জানিবে কেন? দত্তবংশ চিরদিন মান সম্ভ্রমে সমুন্নত ছিল, হঠাৎ সে বংশগৌরবকে তিনি নত করিতে পারিলেন না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনেক ধনী সন্তান বেড়াইতে যাইবার সময় পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইতেন ও উদ্যানাদিতে গিয়া সঙ্গীতাদি আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের সহিত যাইতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু কখনও অন্তরের কথা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। তাঁহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও ঐ বিষয়ে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না। দেখিতেন বটে, তিনি দিন দিন শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছেন, তথাপি উহার মূলে যে পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ ব্যতীত আর কিছু আছে, এরূপ সন্দেহ করিতেন না। স্বামিজী বলিতেন "সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিনী মহামায়াও এইকালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল,

অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল।” এই অবস্থায় আর একদিন কয়েকজন ধনিপুত্র তাঁহাকে এক বাগান বাটীতে লইয়া গিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য আহ্বান করে ও দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অমোঘ ঔষধ বলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিবার পরামর্শ দেয়। এমন কি বলিতে লজ্জা হয় যে, উক্ত চরিত্রহীন বন্ধুবর্গ—একজন বারাঙ্গনাকেও তাঁহার নিকট লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে তাহার পূর্ব্ব পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করেন ও কেন সে ঐরূপ জঘন্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, উহাতে তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ আছে কিনা এবং সে পরকালের সম্বল কিছু করিয়াছে কিনা ইত্যাদি এমন কতগুলি কথা উত্থাপন করেন যে, স্ত্রীলোকটী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করে ও আর সকলের নিকট গিয়া বলে 'ওরূপ লোকের নিকট কি আমায় পাঠাতে আছে?' সেখান হইতে বাহির হইয়া নরেন্দ্র পরিচিত যাহার সহিত দেখা হইল তাহাকেই বলিলেন, 'আমি আজ মদ ও মেয়েমানুষ লইয়া আমোদ করিয়াছি।' বাটীতে স্বীয় জননীর নিকটও ঐ কথা প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ কয়েক ব্যক্তি পরমহংসদেবের কর্ণে এই কথা তুলিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন “নরেনের জন্য তোমাদের মাথা ব্যথার দরকার নাই, আমি জানি তাহার দ্বারা জীবনে কখনও যোষিৎ সঙ্গ হইবে না।”

এইরূপ করিবার একটা কারণ ছিল, গোপনে কোন কার্য্য করা চিরদিন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন

ভয় বা লজ্জায় কোন বিষয় লুকাইবার অভ্যাস তাঁহার হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই বা থাকিলেও তাঁহাকে ডাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি থাকা না থাকাতে কাহারও কিছু আসে যায় না,—নিরাশা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এরূপ ধরণের অভিমানসূচক কথা স্পষ্টবাক্যে লোকের নিকট প্রকাশ করিতে এখন তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হইত না। তাহার উপর মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত চরিত্রহীন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে থাকায় শীঘ্রই রব উঠিল তিনি নাস্তিক হইয়াছেন এবং দুশ্চরিত্র লোকের সংসর্গে মদ্যপান ও বেশ্যালয়ে গমন পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। এই অযথা নিন্দায় তাঁহার আবাল্য-তেজস্বী হৃদয় আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং তিনি আরও ইচ্ছা করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সকলকে বলিতে লাগি ন যে, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ নিজ দুর্দ্দশা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান বা বেশ্যা-গৃহে গমন করে তাহাতে দোষই বা কি; শুধু তাই নহে, যদি তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন যে ঐরূপ করিলে প্রকৃতই সুখ হয়, তাহা হইলে তিনিও ঐরূপ করিতে রাজী আছেন, সেজন্য লোকনিন্দাভয় গ্রাহ্য করিবেন না।

স্বামীজি বলিতেন "ঐরূপ অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে জীবনে যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেই সকলের কথা উজ্জ্বলবর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; জীবনে যতই কেন দুঃখ কষ্ট আসুক না, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে

লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবের হ্রাস হইল না।

"গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, এখনও পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্নপদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না! এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।"*

নরেন্দ্র সংসার চালাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'ফ্রী-মেসন' হইলে যদি কোন সুবিধা হয় এই ভাবিয়া দিনকতক উহাদের দলে মিশিলেন। কয়েকমাস বিদ্যাসাগরের বহু-

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—৫ম ভাগ।

বাজারের স্কুলে শিক্ষকতা করিলেন কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় তাহা ত্যাগ করেন। দিনকতক এটর্ণি নিমাই বসুর articled clerk (এটর্ণি হইবার জন্য শিক্ষানবীশ) হইয়াছিলেন কিন্তু টাকার যোগাড় না হওয়াতে ছাড়িয়া দেন। ফলে এটর্ণির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জ্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম্ম জুটিল না এবং মাতা ভ্রাতাদিগের ভরণ-পোষণের একটা স্বচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না।

দিনকতক পরে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার কয়েকজন জ্ঞাতি ভদ্রাসনখানি ভাগাভাগি করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। ভদ্রাসনের যে অংশ অপেক্ষাকৃত ভাল ও অধিক পরিসর-যুক্ত তাঁহারা সেই অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে আদালতে না গেলে মিটে না। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম যাহাতে গৃহের গোলযোগ প্রকাশ্য আদালতে গিয়া লোকের কর্ণে না উঠে তাহার জন্য আপোষে মিটাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু যখন তাহা হইল না তখন তিনি আহত সিংহের ন্যায় দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (Barrister W. C. Bonarji) তাঁহার পক্ষে মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিলেন। মামলা অনেক দিন ধরিয়া চলিল, এই উপলক্ষে স্বামীজির সাহস ও বুদ্ধিনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষের ইংরাজ ব্যারিষ্টার তাঁহাকে আদালতের সমক্ষে একজন খেয়ালী ছোকরা ('fanatic') প্রতিপন্ন করিবার মানসে 'চেলা' বলিয়া সম্বোধন করেন, কিন্তু নরেন্দ্র ঘাবড়াইবার পাত্র নহেন। তিনি জানিতেন সাহেব বিদেশী লোক, সুতরাং নিজে

'চেলা' শব্দের অর্থ অবগত নহেন। এজন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'Do yo know, sir, what a chela is'? (মহাশয় 'চেলা' কাহাকে বলে আপনি জানেন কি?) সাহেব দেখিলেন ছেলেটি বড় সোজা নয়, তিনি আরও অনেক জেরা করিলেন কিন্তু বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। বিচারক নরেন্দ্রের সপ্রতিভ উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও তাঁহাকে আইনক্লাসের ছাত্র জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন "Young man, you will make a very good lawyer." (যুবক তুমি একজন ভাল উকীল হবে)। অপর পক্ষের এটর্ণিও আদালতের বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন "জজ সাহেবের যা মত আমারও তাই, বাস্তবিক আইন ব্যবসায়ই তোমার উপযুক্ত। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।" মোকর্দ্দমাটি মিটিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় আরম্ভ হইয়া তাঁহার দেহত্যাগের পরও কিছুদিন চলিয়াছিল; ফলে বিশ্বনাথবাবুর পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু খরচার দায়ে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে যে দুঃখকষ্ট গিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। নরেন্দ্র একদিন দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া পরমহংসদেবের কৃপা ভিক্ষা করিতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ছুটিতে ছুটিতে পা হইতে চটি পড়িয়া গিয়াছিল, পথের ধারের জঙ্গলে হাত পা ক্ষতবিক্ষত কিন্তু তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া পরমহংসদেবের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন "কি করি বলুন, কি করি? কোন আশা দেখ্ছি না। আপনি মা কালীকে বলিয়া কহিয়া আমাদের সাংসারিক দুঃখ নিবারণের একটা উপায় করিয়া দিন।"

পরমহংসদেব তাঁহাকে স্বয়ং মার কাছে গিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। নরেন্দ্র প্রথমে সম্মত হইলেন না কারণ দেবদেবীতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না, কিন্তু পরে পরমহংসদেবের পুনঃ পুনঃ আদেশে ৺ভবতারিণী দেবীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যাঁহাকে তিনি এতদিন পাষাণময়ী বলিয়া ভাবিতেন তিনি পাষাণময়ী নহেন, সত্যই চৈতন্যরূপিনী, অনন্ত স্নেহময়ী, বরাভয়দাত্রী জগজ্জননী। তিনি দেবীর পদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বিবেক-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তি প্রার্থনা করিলেন, টাকা পয়সার কথা মনে রহিল না। মাকে দর্শন করিয়া পরমহংসদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরে, মাকে বলিয়াছিস্ ত?' তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, বলিলেন, 'না মহাশয়, সে-কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।' পরমহংসদেব পুনরায় তাঁহাকে কালীঘরে পাঠাইলেন, কিন্তু সেবারও ঐ প্রকার হইল। এইরূপে নরেন্দ্র সংসারিক অভাব জানাইবার জন্য তিন তিনবার দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তিনবারই ধনরত্ন প্রার্থনার পরিবর্ত্তে বিবেক বৈরাগ্য ও জ্ঞান ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। শেষে পুনরায় পরমহংসদেবকে ধরিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে বলিয়াছিলেন 'যাঃ, মার ইচ্ছায় আজ থেকে আর তোদের মোটা ভাত কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'

বিশ্বনাথবাবু ইতিপূর্ব্বে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির (ব্যারিষ্টার আর, মিত্রের) কন্যার সহিত নরেন্দ্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন এই দুর্দ্দশার সময়ে উক্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে সংসারের অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কারণ কন্যার পিতা যৌতুকস্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ-বিমুখ নরেন্দ্র কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ

পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন এবং এ সময়ে একরূপ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিলেন। মাতা বরাবরই পুত্রের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাঁহার শঙ্কা হইল পাছে সাধুসংসর্গের প্রভাবে তিনি একেবারে সংসার ত্যাগ করেন। অনেক সময় ঐ বিষয়ে কথা উত্থাপিত হইত, কিন্তু নরেন্দ্র স্পষ্ট কোন জবাব দিতেন না। তবে তাঁহার আচরণে বেশ বুঝা যাইত যে, মাতাকে তিনি দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিয়া সহসা কোথাও যাইবেন না। কিন্তু তিনি বিবাহবিষয়ে মাতৃ-অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। বাটীর সকলেই তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করিলেন। তারপর যখন বুঝিলেন যে তাঁহার উপর আর নির্ভর না করিলেও সংসার চলিবে তখন তিনি অল্প অল্প করিয়া সংসার ছাড়িলেন। প্রথম প্রথম অধিকাংশ সময়ই দক্ষিণেশ্বরে কাটাইতেন, তারপর পরমহংসদেব পীড়ার নিমিত্ত কাশীপুরের বাগানে আনীত হইলে প্রায় সেখানেই থাকিতেন। ক্রমে যত তাঁহার পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই অধিকক্ষণ তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেবের দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি দিবারাত্রের মধ্যে প্রায় কখনও তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই।

সংসার ত্যাগ করিলেও নরেন্দ্র একেবারে সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন না। যখন তিনি কলিকাতায় থাকিতেন তখন

মাঝে মাঝে গৃহে যাইতেন। শত-স্মৃতি বিজড়িত গৃহপ্রাঙ্গনটি তাঁহার নিকট তীর্থের ন্যায় পবিত্র ছিল। তাহার উপর উহা তাঁহার জননীর পদধূলিপূত। জননীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ভগ্নীদেরও এত ভালবাসিতেন যে প্রব্রজ্যাকালে তাহাদের কষ্টে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া শোকে অধীর হইয়াছিলেন। জননীও তাহার কথা স্মরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। স্বামিজীর একজন শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন 'আমার ছেলে চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিল।' কিন্তু পরমহংদেব আরও অধিক দূর যাইতেন। তিনি বলিতেন, 'নরেন আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী', 'নিত্য সিদ্ধের থাক।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে।

প্রথম দর্শন হইতে পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ছয়মাস পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তাহাকে না দেখিলে অধীর হইয়া উঠিতেন ও যাহাকে পাইতেন জিজ্ঞাসা করিতেন—কেন এমন হইতেছে? তিনি বলিতেন 'নরেন্দ্রের জন্য বুকের ভিতর যেন মোচড় দিচ্ছে।' নরেন্দ্র যে খুব উচ্চ আধার তাহা তিনি প্রথম দিন দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিলেন 'কল্‌কাতার মত স্থানে এমন সত্ত্বগুণী আধারও থাকিতে পারে!' এবং তাহাকে পৃথক্ ডাকিয়া লইয়া গিয়া স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইয়াছিলেন। তাহাতে অন্য সকলে তাহাকে একদেশদর্শী বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রেকে এত ভালবাসিতেন যে সহজে তাহার কথা উড়াইয়া দিতেন না। নরেন্দ্র যখন বলিতেন 'রূপ টুপ আপনার মাথার খেয়াল' তখন তিনি কাঁদিয়া মা কালীকে বলিয়াছিলেন 'মা, নরেন্দ্র বলে এসব আমার মাথার ভুল, সত্যি কি?' মা তাঁহাকে বলিয়া দেন 'না, ওসব ঠিক—ভুল নয়, নরেন্দ্র ছেলে মানুষ তাই অমন বলে'। তখন আবার তিনি স্বামীজিকে বলেন 'তুই যা খুসি বল্ না কেন, আমি গ্রাহ্য করি না'। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম বুঝিতে পারিতেন না—তাঁহার জন্য পরমহংসদেব অতটা করেন কেন? সেই জন্য একদিন বলিয়াছিলেন 'আপনার শেষ কালে না ভরতরাজার যো হয়! ভরতরাজা 'হরিণ' ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রাণত্যাগ করেছিলেন ব'লে পরজন্মে হরিণ জন্ম গ্রহণ কর্‌তে হ'য়েছিল।' পরমহংসদেব এ কথার কোন উত্তর

দেন নাই। এক এক সময়ে তাঁহার নিজেরও মনে হইত—কেন এমন হয়? সামান্য একজন বালক, তাহার জন্য তাঁর এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন হয়? তিনি মা'র নিকট কাঁদিয়া ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে মা নাকি বলিয়াছিলেন 'তার ভেতর নারায়ণের সত্তা দেখ্‌তে পাস্‌ ব'লে অমন্‌ হয়।' হাজরা বলিয়া একব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে থাকিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন 'তুমি দিনরাত এই সব ছোঁড়াদের ভাবনা ভাবো, ভগবান্‌কে ভাব্‌বে কখন?' তাহাতে পরমহংসদেব মা'র নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন 'মা, হাজ্‌রা বলে নরেন্দ্রের আর এইসব ছেলেদের জন্য এত ভাবি কেন?' তাহাতে মা তাঁহাকে স্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন যে, তিনিই সব মানুষ হয়েছেন, তবে শুদ্ধ আধারে তাঁর প্রকাশ বেশী। তিনি গল্প করিতেন, "সেইরূপ দর্শন ক'রে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গ্‌লো, হাজরার উপর রাগ করলুম। বল্লুম 'শালা, আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল,' আবার ভাবলুম 'ও বেচারীরই বা কি দোষ? কেমন ক'রে জান্‌বে?'" তিনি আরও বলিতেন "আমি দেখি ছোকরারা যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রকে যখন প্রথম দেখি তখন তার শরীরের হুঁস ছিল না। যেই ছুঁলুম অমনি বাহ্যজ্ঞান হারালো। তারপর তাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণের ভেতর আকুলি-বিকুলি কর্ত্তে লাগ্‌লো। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হ'তো যে, মনে হ'ত বুকের ভেতরটা কে যেন গামছা নিংড়োবার মত জোর ক'রে নিংড়াচ্ছে। তখন আর সাম্‌লাতে পার্ত্তুম না, ছু'টে বাগানের উত্তরাংশে চলে যেতুম, ঝাউতলায় যেখানে বড় একটা কেউ যায় না—সেই খানে গিয়া চীৎকার কর্ত্তাম 'ওরে তুই আয়রে—তোকে না দেখে আর থাকৃতে পারৃছি না রে।' খানিকটা এই রকমে

ডাক ছেড়ে কাঁদলে তবে মনটা ঠাণ্ডা হতো। ক্রমান্বয়ে ছয়মাস ঐ রকম হয়েছিল। আর সব ছেলেরা যারা এখানে এসেছে তাদের কাহার কাহার জন্য কখন কখন মন কেমন করেছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হয়েছিল তার তুলনায় সে সব কিছুই নয়। একদিন ভোলানাথকে * বললুম 'হ্যাঁ গা, আমার এমন হ'চ্ছে কেন?' ভোলানাথ বল্লে, 'এর মানে ভারতে (মহাভারত) আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে, সত্ত্বগুণী লোক দেখ্‌লে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনে শান্তি হয়। তবুও আবার মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখ্‌বো ব'লে ব'সে ব'সে কাঁদতুম।"

নরেন্দ্রের অদর্শনে তাঁহার এদিকে যেমন এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হইত নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতে আবার সেইরূপ অসীম আনন্দ উথলিয়া উঠিত। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় স্বামীজির বি, এ, পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার একদিনের কথা ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের উদ্বোধনে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নরেন অনেক দিন তাঁহার নিকট না যাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের 'ঠঙে' আগমন করেন। সেদিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্ন্যাল বসিয়া কখন পাঠ করিতেছেন, আবার কখন বা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে বহির্দ্বারে 'নরেন, নরেন' শব্দ শুনা গেল। স্বর শুনিয়াই নরেন অতীব ব্যস্ত হইয়া দ্রুত নীচে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধুরাও বুঝিলেন পরমহংসদেব আসিয়াছেন, তাই নরেন এত ব্যস্ত

* দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী।

তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। বন্ধুরা দেখিলেন সিঁড়ির মধ্যস্থলেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন "তুই এতদিন যাস্‌নি কেন? তুই এতদিন যাস্‌নি কেন?" বারম্বার এই বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া বসিলেন। পরে আপনার গামছায় বাঁধা সন্দেশ ছিল, খুলিয়া নরেনকে 'খা, খা' বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নরেনকে দেখিতে যখনি আসেন তখনি কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাঁহার জন্য বাঁধিয়া আনেন; মধ্যে মধ্যে লোকদ্বারা পাঠাইয়াও দেন। নরেন একলা খাইবার পাত্র নহেন, তাহা হইতে কতকগুলি সন্দেশ লইয়া অগ্রে তাঁহার বন্ধুদের দিয়া তবে খাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন "ওরে তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা।" অমনি তানপুরা লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিনী।
(তুমি) নিত্যানন্দ স্বরূপিনী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্ম-বাসিনী॥ ইত্যাদি।

"গানও আরম্ভ হইল, শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন উর্দ্ধে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমানুষীভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্ব্বে কোন মানুষে এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি বা তিনি শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি

জল আনিয়া তাঁহার মুখে সেচন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন "জল দেবার দরকার নেই, উনি অজ্ঞান হন্ নি—ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে এখন।" নরেন্দ্র এইবার শ্যামাবিষয়ক গান ধরিলেন—"একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ্ মা শ্যামা"। শ্যামাবিষয়ক অনেক গান হইল, কৃষ্ণ-বিষয়ক গানও অনেক হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখনও ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, আবার কখনও বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন, অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন "দক্ষিণেশ্বর যাবি? কদিন ত যাস্ নি, চল্ না—আবার এখনি ফিরে আসিস্।" নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল, কেবলমাত্র তানপুরাটী যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন, বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

নরেন্দ্রের উপর পরমহংসদেবের ভালবাসা কত গভীর ছিল ও কিরূপ স্নেহচক্ষে তিনি তাঁহাকে দেখিতেন সামান্য লেখনী দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায় না। যে সময় নরেন্দ্র পরিবারবর্গের অন্ন সংস্থানের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত, তখন তাঁহার মনে হইল যে সাধারণ লোকের ন্যায় অর্থার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই তাঁহার জন্ম হয় নাই—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। যাইবার সমস্তই ঠিক, এমন সময় পরমহংসদেব একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে জনৈক ভক্তের বাটীতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন ভালই হইল, গুরু দর্শন করিয়া এইবার চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিবেন। এই মানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পরমহংসদেব

তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন! নরেন্দ্র নানা ওজর আপত্তি করিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। অগত্যা ঠাকুরের প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার সহিত গাড়ীতে উঠিলেন, তখন আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া পরমহংসদেব সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত গৃহমধ্যে উপবেশন করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া নরেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনেত্রে গাহিতে লাগিলেন—

'কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই (আমার) মনে সন্দ হয় বুঝি তোমায় হারাই হা—রাই।' নরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অন্তরের রুদ্ধ ভাবরাশি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, ঠাকুরের ন্যায় তাঁহারও বক্ষ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন ঠাকুর নিশ্চয়ই সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ আচরণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইবার পর কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন 'আমাদের ও একটা হ'য়ে গেল।' সেই দিন রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া 'জানি আমি তুমি মা'র কাজের জন্য এসেছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক'—এই বলিয়া হৃদয়ের আবেগে পুনরায় অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি ও তাহার স্মৃতি কত মধুর তাহা উপরিলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। যে ভালবাসায় ভেদাভেদ থাকে না, যাহা পরকে আপন করিয়া লয়, যে ভালবাসা বিশ্বপ্রেমের নামান্তর মাত্র, এই চিত্রে পাঠক তাহারই আভাস পাইবেন। নরেন্দ্র বলিতেন 'ঠাকুরের এই ভালবাসাই

আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে—একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্য সকলে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভাণমাত্র করিয়া থাকে।'

পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন 'খুব উঁচু ঘর, পুরুষের সত্তা; এত ভক্ত আস্‌ছে, ওর মত একটিও নাই।' ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি নরেন্দ্রকে কত বড় আধার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সকলেরই ভিতরের অবস্থা উত্তমরূপে জানিতেন এবং সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন 'কেশবের যদি একটা বড় শক্তি থাকে, নরেন্দ্রের সে রকম আঠারটা শক্তি আছে।' আর একবার বলেছিলেন, 'দেখ্‌লুম যেন কেশবের ভিতর একটা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বল্‌ছে, আর নরেন্দ্রের মধ্যে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাচ্ছে।' অন্যান্য শিষ্যের নিকট হইতে তিনি সেবা গ্রহণ করিতেন, কেহ তাঁহাকে বাতাস করিত, কেহ পা টিপিয়া দিত, কিন্তু নরেন্দ্রকে তিনি কখনও সেবা করিতে দিতেন না। বোধ হয় তাঁহাকে নারায়ণ জ্ঞান করিতেন বলিয়াই ঐরূপ করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু তিনি বলিতেন 'তোর পথ আলাদা।'

পরমহংসদেব যে নরেন্দ্রকে অতিশয় উচ্চ আধার বলিয়া মনে করিতেন, একথা তিনি নরেন্দ্রের সম্মুখে এবং তাঁহার অসাক্ষাতে অন্যান্য ভক্তদের নিকটও বহুবার প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি প্রায় বলিতেন—'ও খাপ-খোলা তলোয়ার', 'পুরুষের ভাব ওর ভেতর', 'ও অখণ্ডের (নিরাকারের) ঘর', 'সপ্তর্ষির* একজন,' 'নর-

---

* এই সপ্তর্ষি পুরাণোক্ত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি নহেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিপথে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিয়াছিলেন, 'অখণ্ডের রাজ্যে'

নারায়ণ ঋষির নর' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত সাধারণ গুণের জন্যও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তাঁহার নিকট যে কেহ যাইতেন প্রায় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি নরেন্দ্রকে জানেন কিনা, ও পরক্ষণেই বলিতেন 'খুব ছেলে, গাইতে বাজাতে, লেখায় পড়ায়, সব দিকে আছে। যে দিকে যাবে একটা কাণ্ড করে তুলবে' ইত্যাদি।

নরেন্দ্র কিন্তু তাঁহাকে প্রথম প্রথম অনেকটা অর্দ্ধোন্মাদ বা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া মনে করিতেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এরূপ মনে করা সত্ত্বেও তাঁহার অলোকসামান্য চরিত্র, অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেম ও তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি নিজে তখন কালী রাধা প্রভৃতি দেব দেবী কিছু মানিতেন না, আবার অদ্বৈততত্ত্বও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। আমরা শুনিয়াছি একদিন তিনি, "সবই ব্রহ্ম"—এই কথা শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ,—তাও কি কখন হয়? তা হ'লে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম,।' কিন্তু অন্যান্য লোকের কথার সহিত পরমহংসদেবের কথার এই পার্থক্য ছিল যে, অন্যে শুধু পুস্তক পাঠ করিরা ধর্ম্মের কথা বলে, কিন্তু পরমহংসদেবের পুঁথিগত বিদ্যা মোটেই ছিল না, সমস্তই সাধনলব্ধ জ্ঞান। সুতরাং তিনি যে কথা বলিতেন তাহার মধ্যে খুব একটা জোর আছে বুঝিতে পারা যাইত। তা'ছাড়া পরমহংসদেব শুষ্ক বিচার অপেক্ষা বিবেক বৈরাগ্য-যুক্ত বিচার ও প্রেমভক্তিকে ঈশ্বরলাভের পক্ষে অধিকতর অনুকূল বলিয়া প্রকাশ করিতেন। নরেন্দ্রকেও তিনি ক্রমশঃ এই পথে

'দিব্য-জ্যোতিঃঘন-তনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সমাধিস্থ হইয়া আছেন' এবং নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাঁহাদেরই একজন বিলোমমার্গে' ধরাধামে অবতীর্ণ বুঝিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—৫ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়ে এই বিষয় সবিস্তার লিপিবদ্ধ আছে)।

পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী মহা শুদ্ধ-সত্ত্ব আধার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই বলিতেন 'এ নিত্যসিদ্ধের থাক।' আরও বলিতেন 'এ যেদিন নিজকে জান্‌তে পার্‌বে সেদিন আর দেহ রাখ্‌বে না।' নরেন্দ্রের মায়া-রাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কিঞ্চিৎ মায়ার প্রভাব না থাকিলে পাছে তিনি জগতের কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে স্বস্বরূপে প্রয়াণ করেন, এই ভয়ে তিনি মহামায়ার নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেন—'মা ওর ভেতর একটু মায়া প্রবেশ করাইয়া দে, নতুবা কোন কাজ হবে না।' এইরূপ উত্তম অধিকারী প্রাপ্ত হইয়া পরমহংসদেবের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহারই সাহায্যে আবার সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইবে। তাই তিনি সযত্নে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের ভ্রান্ত সংস্কারগুলির উচ্ছেদ সাধন করিতেছিলেন। যে নরেন্দ্র প্রথমে কিছুই মানিতেন না, ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন, তিনি ক্রমে সবই মানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিপদে পরমহংসদেবকে বাজাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কথা বা উপদেশ বিনা প্রমাণে সত্য বলিয়া মানিয়া লন নাই। প্রথম তাঁহার প্রত্যেক কথায় সন্দিহান হইয়া পরীক্ষা করিতেন, তারপর পুনঃ পুনঃ তাহাদের সত্যতার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়া শেষে ওরূপ অভ্যাস অনেকটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। অনেক সময় পরমহংসদেব যাহার তাহার হাতে জল খাইতেন না, বা যাহার তাহার স্পৃষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না। নরেন্দ্র মনে করিতেন উহা কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ লোকগুলি

বিশুদ্ধচরিত্র নহে। প্রথমে একথা নরেন্দ্রের তত বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন, বাস্তবিকই লোকগুলা অতি হীনচরিত্রের!

ভদ্রবেশী সাধারণ লোকদিগের অতি গোপনতম পাপ বা নিন্দনীয় আচরণও যে পরমহংসদেবের সূক্ষ্মদৃষ্টির অগোচর ছিল না, তাহা উপরোক্ত ব্যাপার হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু নরেন্দ্রের স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার উপর এই সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষের এরূপ অটল বিশ্বাস ছিল, যে তিনি প্রায় বলিতেন 'ও হচ্ছে আগুণ, ওর স্পর্শে পাপ-তাপ সব পুড়ে খাক্ হয়। ও যদি শোর গরুও খায় কোন দোষ হবে না।' ইহা দ্বারা বোধ হয় তিনি নরেন্দ্রকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পর্য্যায়ে ফেলিতেন।*

এদিকে নরেন্দ্র সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা, কিন্তু তাঁহার ভুল ভ্রান্তি দেখিলে তিনি কখনও তাহার সমর্থন করিতেন না।

---

* ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া পরমহংসদেব স্বয়ং নানা নিয়ম পালন পূর্ব্বক ভক্তসকলকে তদ্রূপ করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন, কিন্তু তিনিই আবার বলিতেন—নরেন্দ্র ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কিন্তু তাহার কোন প্রত্যবায় হইবে না। 'নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার আহার্য্যদোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে সেজন্য যেখানে সেখানে যা' তা' ভোজন করিলেও তাহার মন কখন কলুষিত হইবে না—জ্ঞানরূপ অসিধারা সে সর্ব্বদা মায়ার সমস্ত বন্ধনকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, মহামায়া সেজন্য তাহাকে কোনমতে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না'—এইরূপ কত কথাই তিনি তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মাড়ওয়ারী ভক্তেরা পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিয়া সর্ব্বদা নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিত। তিনি বলিতেন 'ওরা নিষ্কামভাবে দান করিতে জানে না, এক খিলি পান দিবার সময়ও ষোলটা কামনা ক'রে দেয়, ঐরূপ দ্রব্য ভোজনে ভক্তির হানি হয়'; কিন্তু তাহাদের প্রদত্ত ঐ সকল দ্রব্য নরেন্দ্রকে খাইতে দিতেন ও বলিতেন 'ওতে ওর কোন হানি হবে না, ও সব হজম ক'রে ফেলবে।'

নরেন্দ্র একবার পরমহংসদেবের নিকট ভক্তের ভগবদ্ বিশ্বাসকে 'অন্ধ বিশ্বাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তিনি তদুত্তরে বলেন—"বিশ্বাসের আবার অন্ধ কি করে? বিশ্বাসমাত্রেই ত অন্ধ! বিশ্বাসের কি আবার চোখ আছে নাকি? হয় বল্ শুধু 'বিশ্বাস' না হয় বল 'জ্ঞান'। তা না হয়ে আবার 'অন্ধ-বিশ্বাস', চোখওয়ালা-'বিশ্বাস'—একি রকম!"

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে বই পড়িয়া বা পরের মুখে শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা ধর্ম্ম নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম অনুভূতিসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে দর্শন করা চাই, তাই তিনি ব্রাহ্ম মহর্ষি দেবন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কিনা। কারণ যদিও তিনি তৎপূর্ব্বে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে একজন ধর্ম্মোন্মাদ ব্যতীত আর বিশেষ কিছু মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্র, কেশবপ্রমুখ আচার্য্যগণ তখন বাঙ্গলার নব্য যুবকগণের নেতা। নরেন্দ্র নিজেও ব্রাহ্মধর্ম্মের ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। দেবদেবী কিছুই মানিতেন না। কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে যখন তাঁহার ধারণা হইল যে, ঈশ্বর অনুভূতির গোচর, অথচ সেই ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে মহর্ষির নিকট হইতে তিনি কোন প্রকার আভাস প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় ছাড়িয়া পরমহংদেবের চরণাশ্রয় করিলেন ও ধ্যান ধারণা, তপস্যা, বিবেক-বৈরাগ্য, বিচারসহায়তায় ও সর্ব্বোপরি অবতারকল্প সদ্‌গুরুর কৃপায়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর লাভ এখানে পরমহংসদেবের শিক্ষায় ও তাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্তে তিনি শেষে যাহার নিরাকার দুই-ই মানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মও মানিতে খাত্মাদি কালী, কৃষ্ণ, শিবও মানিতেন। এ বড় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কিন্তু, কিন্তু সংগ্রামের ফলে সাধিত হইয়াছিল। এ সংগ্রামে দাঁড়াইয়াছিলেন-লোকগুলি

মূর্ত্তিমান্ সনাতনধর্ম্ম ও অপরদিকে প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী নব্যতন্ত্র—এ দুয়ের সংঘর্ষে পরিশেষে কিন্তু সনাতনধর্ম্মেরই জয় হইল !

পরমহংসদেবের মহিমময় চরিত্রে যুবক নরেন্দ্র এতদূর মোহিত হইলেন, যে পিতার মৃত্যুর পর সংসারের অনন্ত দুর্দ্দশা, জননী ও ভাইভগিনীগুলির বিষাদকরুণ মুখচ্ছবি, অনশন, অর্দ্ধাশন কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলেন। দারুণ দুঃখে হৃদয় জরজর, কিন্তু তথাপি যেন হৃদয়ের মধ্যে কাহার ডাক শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব তাঁহাকে কালীঘরে গিয়া প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি ধনরত্নাদি প্রার্থনা না করিয়া তিন তিন বার শুধু জ্ঞান ভক্তিরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পুর্ব্বে বলিয়াছি প্রথম প্রথম তিনি অদ্বৈতবাদ বুঝিতে পারিতেন না। 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ'—এরূপ মনে করা কি ঘোর অপরাধ ও স্পর্দ্ধা নয়? কিন্তু পরমহংসদেব তাঁহাকে কেবল অদ্বৈত প্রতিপাদক শাস্ত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে উপদেশ দিতেন। অন্যান্য শিষ্যদিগকে তিনি সাধারণতঃ ভক্তিশাস্ত্রই পাঠ করিতে বলিতেন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষভাবে অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি অদ্বৈতমূলক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছিলেন, এবং তিনিও প্রথম প্রথম ঐ সকল গ্রন্থ স্বয়ং পাঠে অনিচ্ছুক থাকিলেও পরমহংসদেবের কথায় তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিয়াছিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে তিনি বুঝিলেন, অদ্বৈততত্ত্বই চরম ও পরম সত্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন বেদান্তাদি শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। ১৮৮৫ সালে এইরূপ...পুরের বাগানে পরমহংসদেবের পীড়ার সময় নরেন্দ্র এই সত্য লাভ ভক্তেরা প...লেন। তিনি প্রথম হইতেই অনেকটা 'দার্শনিক' ছিলেন, কিন্তু প্রদান করিত...দেবের সংস্পর্শে আসিয়া 'ভক্ত' হইয়া পড়িলেন। শেষে পান দিবার ...ইয়াছিল যে, খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন ও হাত কিন্তু তাহাদে... করিয়া নাচিতেন। কাশীপুরের বাগানে থাকিতে নরেন্দ্র কোন হানি

সত্যলাভের জন্য বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য, মনে দারুণ অশান্তি। তিনি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী ও বিল্বতরুমূলে সাধনা করিবার জন্য পরমহংসদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; পরমহংসদেব সহর্ষে বলিলেন 'পড়াশুনো কি ছেড়ে দিবি নাকি?' নরেন্দ্র উত্তর করিলেন 'ম'শায়, যদি এমন একটা ওষুধ পাই যা খেলে এ পর্য্যন্ত যা কিছু শিখিছি সব ভুলে যেতে পারি, তাহলে প্রাণটা যেন বাঁচে।' এই সময়ে তিনি প্রায় প্রত্যহ রাত্রে কাশীপুরের বাগান হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গিয়া পঞ্চবটীতে ও বিল্ববৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া সাধনা করিতেন। অনেক সময় ধ্যান করিতে করিতে ললাটের অভ্যন্তরে একটা ত্রিকোণাকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন। উহাকে পরমহংসদেব 'ব্রহ্মযোনি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। অনেক সময় আবার দেখিতেন ধুনির ধারে নানা দেবদেবীর সমাগম হইয়াছে। ঐরূপ সাধনের ফলে ক্রমশঃ তাঁহার মানসিক অশান্তি ও সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং কিছু শক্তিও লাভ হইয়াছিল। কালী (অভেদানন্দ) নামক একজন গুরুভ্রাতাকে একদিন তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিতে বলেন, তিনি ঐরূপ করায় যেন একটা বৈদ্যুতিক তেজের ন্যায় কি অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অন্তঃসুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট অনেক ভক্ত যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম্ম গ্রহণে নরেন্দ্রের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। একদিন তিনি বৈষ্ণবমতের সার মর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া বলিলেন "তিনটি বিষয় পালন করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায়—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর —নাম ও নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে। সেইরূপ ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা ও পূজা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার—এ কথা

ধারণা করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"জীবে দয়া!—দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

লীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, "ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাব ভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎসংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া, তাহাদিগের উপর ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে সে সকলই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল যে, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার

অংশ—সবই তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে অল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিবে।'

এই বলিয়া দেখাইলেন, ঠাকুরের ঐ কথায় শুধু জ্ঞানমার্গ নহে, ভক্তি, কর্ম্ম, রাজযোগাদি সকল মার্গের লোকই বিশেষ আলোক পাইবেন।"

নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের কিঞ্চিদধিক চারিবৎসর পরে পরমহংসদেবের গলাভ্যন্তরে 'ক্যান্সার' (কর্কট রোগ) নামক ক্ষত হয় ও তন্নিবন্ধন তিনি চিকিৎসার্থ প্রথমে কলিকাতা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে ও তাহার কিছুদিন পর কাশীপুরের বাগানে আনীত হন। ইহার প্রায় আট মাসকাল পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। শেষের এই কয়মাস তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহার চিকিৎসাদি ব্যাপারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং শশী প্রভৃতি কয়েকজন যুবকভক্ত প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য সতত তৎসান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নরেন্দ্রই এই সকল যুবক সেবকগণের অগ্রণী ছিলেন। এই সময়েই কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষভাবে পরমহংসদেবকে জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং কঠিন ও ক্লেশকর পীড়াসত্ত্বেও পরমহংসদেব সতত তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এমন কি এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহার ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, কিন্তু চিকিৎসকগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি জগৎ-কল্যাণ সাধনে বিরত থাকিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তগণের ভিতর বৈরাগ্য, নিরভিমানিত্ব প্রভৃতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে সমীপস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া 'মাধুকরী' করিতে আদেশ করিতেন এবং তাঁহারা ঐরূপ

করিলে তিনি বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিতেন। এই সময়ে একদিন পরমহংসদেব তাঁহাদের ডাকিয়া ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাহারাও তাঁহার বাক্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভিক্ষাপাত্র হস্তে পল্লীমধ্যে বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। এইকালে তিনি একদিন, যুবক ভক্তদের যাঁহারা তাঁহার সেবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেন তাঁহাদিগকে গেরুয়া প্রদান করিয়া সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন ও তদবধি তাঁহাদের যেখানে সেখানে আহারাদি করিলেও কোন দোষ স্পর্শাবে না বলিয়া দেন।

রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের অব্যবহিত কয়েক দিবস পূর্ব্বে, তাঁহার শিষ্যেরা একদিকে যেমন তাঁহাকে পাছে হারাইতে হয় মনে করিয়া দুঃখের সাগরে ভাসিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ধ্যান-ধারণা ও তপস্যাদিতে অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইতে-ছিলেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে পরমহংসদেবের যন্ত্রণা নিবারণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া নিতান্ত হতাশভাবে ছুটাছুটী করিতেন। একদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে করিয়াই হউক পরমহংসদেবের যন্ত্রণা নিবারণে সমর্থ একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং সন্ধ্যার পর হইতেই 'রাম' 'রাম' শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বাগানের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল মানসিক আবেগে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত-প্রায় হইয়াছিল, কিন্তু ভিতরে দারুণ অশান্তির আগুন জ্বলিতেছিল। তিনি সমস্ত রাত্রি ঐরূপ করিয়া বেড়াইলেন এবং যতই রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। রজনীর শেষযামে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার উক্তবিধ চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া

আসিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখে, সেইজন্য একজনকে বলিলেন 'যা, নরেনকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।' কিন্তু নরেন্দ্রকে কেহই থামাইতে পারিল না। তখন সকলে তাঁহাকে এক প্রকার জোর করিয়া ধরিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন 'হ্যাঁরে, তুই ও রকম কচ্চিস্ কেন? ওতে কি হবে?' কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় বলিলেন 'গ্যাখ্, তুই এখন যেমন কচ্চিস্ এমনি বারটা বছর (আমার) মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন ব'য়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি কর্ব্বি বাবা!'

কাশীপুরের বাগানটী ক্রমশঃ একাধারে তীর্থ ও শিক্ষাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। নিত্য মহা মহা পণ্ডিত ও ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল ও দর্শনাদি শাস্ত্র বিষয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও স্তোত্রাদিরও অভাব ছিল না। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে বলিতেন, 'ম'শায়, এমন একটা ওষুধ দিন যাতে আমার মনের ব্যারামগুলো যায়!' পরমহংসদেব তখন হয় তাঁহাকে গান গাহিতে বলিতেন, না হয় বলিতেন 'যা, ধ্যান কর্‌গে'; এবং ঐ সকল ধ্যানকালে নরেন্দ্রের বহুবিধ বিচিত্র অনুভূতি হইত। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' তাহাতে নরেন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্যি ব'লে না বোধ হয় ততক্ষণ কিছুই বল্‌বো না।' পরমহংসদেব তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও মুক্তকণ্ঠে নিঃসন্দেহে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহস দেখিয়া প্রীতই হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র এমন কি একথাও বলিয়াছিলেন 'আমি ঈশ্বরও চাই না। আমি চাই শান্তি, —সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্।'

এই কালে সাধন প্রভাবে নরেন্দ্রের এক অদ্ভুত রকমের দর্শন

হইত। ধ্যানাবস্থার পরে দেখিতেন, যেন ঠিক তাঁহারই মত আর একজন কে আসিয়াছে। আকার প্রকার ও অবয়বাদির গঠন অবিকল তাঁহারই মত। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন 'এ আবার কে?' সে মূর্ত্তিটি অনেক সময়ে একঘণ্টারও উপর তাঁহার নিকট থাকিত। তিনি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেও ঠিক সেই সময়ে কথা বলিত। তিনি যেরূপ করিতেন, সেও ঠিক সেইরূপ করিত, তিনি কখনও তাহাকে ভেংচাইতেন সেও ঠিক সেইরূপ করিত। প্রথম প্রথম এইরূপ হইলে তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিয়াছিলেন 'ইহা ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ।'

১৮৮৬ সালের এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালীন নরেন্দ্র একদিন তারক ও কালীকে (শিবানন্দ ও অভেদানন্দ) সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়া দর্শনে গমন করেন। ললিতবিস্তর ও ত্রিপিটক পাঠে ভগবান্ বুদ্ধদেবের অসাধারণ ত্যাগ ও বৈরাগ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সাধনস্থল দেখিবার জন্য নরেন্দ্রের মনে প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল। বুদ্ধগয়া যাত্রা তাহারই ফল। গয়ায় পৌঁছিয়া ফল্গুতে স্নান ও ভিক্ষাদি করিয়া তাঁহারা পদব্রজে বোধগয়ায় গেলেন ও সেখানকার মোহান্ত মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোহন্তজী তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধগয়ার প্রত্যেক স্থল, বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে দর্শন করিলেন। সেই শত শত বৎসরের অতীত কীর্ত্তি-ধামের প্রতি রেণু একদিন ভগবান্ তথাগতের চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয় ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি গুরুভাইদের সঙ্গে বোধিবৃক্ষতলস্থ প্রস্তরবেদীতে

বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দ্দিকে গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্র সহসা দরবিগলিতাশ্রু হইয়া, সমীপবর্ত্তী গুরুভ্রাতার কণ্ঠে হস্তার্পণ পূর্ব্বক অতি প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। গুরুভ্রাতা তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন নরেন্দ্র আবার গভীর ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। তিনি কেন যে ঐরূপ করিয়াছিলেন, সে রহস্য ভেদ করিবার আর উপায় নাই। খুব সম্ভবতঃ ধ্যানযোগে তথাগতের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া যেন তাঁহারই চরণালিঙ্গন করিতেছেন, এই ভাবিয়া তিনি সম্মুখে যাহা পাইয়াছিলেন তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

বুদ্ধগয়ায় তাঁহারা তিন দিবস রহিলেন। নরেন্দ্রের আরও অধিক দূর ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদ্বয় পরমহংসদেবের সংবাদ না পাইয়া কাতর হইয়া পড়ায়, তিনি অগত্যা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

যাত্রাকালে তাঁহারা পরমহংসদেব বা আর কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই, সুতরাং তাঁহাদের অকস্মাৎ অদর্শনে সকলেই বিচলিত হইয়াছিলেন। গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। একে অপরকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। তাহার উপর নরেন্দ্র সকলেরই নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। সেই নরেন্দ্রের এইরূপ অদর্শনে তাঁহারা কি হইল কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং সকলে মিলিয়া পরমহংসদেবের কাণে একথা তুলিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু মৃদুহাস্য করিলেন। তারপর বলিলেন 'সে কোথায়ও যাবে না,

তাকে এখানে আস্‌তেই হ'বে।' এই বলিয়া নিম্নলিখিত গল্পটী বলিলেন —'দেখ্‌ একটা ময়ূর একজনের বাগানে রোজ আস্‌তো, সে লোকটা খাবারের সঙ্গে একটু আফিঙ্‌ মিশিয়ে ময়ূরটাকে রোজ খেতে দিত। দিনকতক পরে ময়ূরটার এমনি অভ্যাস হয়ে গেল যে বাগানে না এসে আর থাক্‌তে পারতো না। নরেনেরও জান্‌বি সেই অবস্থা। এদিক ওদিক যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়ে যাবে কোথায়?'

কিন্তু তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন নরেন্দ্রাদি ফিরিলেন না, তখন তাঁহারা উদ্বিগ্নচিত্তে নরেন্দ্র যাহাতে ফিরিয়া আইসে তাহার উপায় করিবার জন্য পরমহংসদেবকে ধরিয়া বসিলেন। পরমহংসদেব তাহাতে মাটিতে একটি দাগ কাটিয়া বলিয়াছিলেন 'এর বেশী আর তাদের যাবার ক্ষমতা নেই।' এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নরেন্দ্রাদি প্রত্যাগমন করিলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইলেন ও নৃত্যগীতবাদ্য করিয়া আনন্দের হাট বসাইলেন।

কাশীপুরের বাগানে থাকিতে নরেন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি ভাল হ'লে তুই যা চাইবি দেব।" তাহাতে নরেন্দ্র একদিন বলেন, "কিন্তু আপনি যদি আর ভাল না হন, তা হ'লে আমার কি হবে?" পরমহংসদেব অন্যমনস্ক ও কতকটা স্বগতোক্তিভাবে বলিয়াছিলেন, "শালা বলে কি?" বোধ হয় তিনি প্রাণতুল্য প্রিয়শিষ্যের অমূলক আশঙ্কা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন নরেন্দ্রের ন্যায় উপযুক্ত শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি কোনও গুরুর বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে না। যাহা হউক, তারপর তিনি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা তুই কি

চাস্ বল্।” নরেন্দ্র বলিলেন, “আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চ'লে যাই।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “ছিছি! তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এইকথা! আমি ভেবেছিলুম কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হ'য়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস্? এ তো তুচ্ছ, অতি হীন কথা। নারে, অত ছোট নজর করিস্নি। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নিগুর্ণভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্ত্তির ভিতর ঐহিক সম্বন্ধবোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর্। একাধারে জ্ঞানী আর ভক্ত দু'ই হ।”

উপরোক্তরূপ তিরস্কারসূচক বাক্যে নরেন্দ্রের চক্ষু হইতে অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি পরমহংসদেবের মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে পরমহংসদেব তাঁহাকে সমাধিলাভ করিতে নিষেধ বা নিরুৎসাহ করিতেছেন না, কিন্তু সেই অবস্থালাভই তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নহে ইহাই বলিতেছেন। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে কোটি কোটি জীব ঘোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে তাহাদেরও উপায় করা তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। সাধারণ লোকেরাই আপন মুক্তির প্রয়াসী হয় কিন্তু নরেন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ পুরুষের পক্ষে (যাঁহাকে তিনি নিত্যসিদ্ধ বা আচার্য্য কোটির থাক্ বলিয়া উল্লেখ করিতেন) ঐরূপ মুক্তির প্রয়াসী হওয়া বিশেষ শ্লাঘনীয় নহে। রাজপুত্র কি মুটে মজুরের ন্যায় দুই চারি টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে শোভা পায়?

ঘটনাক্রমে কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পর নরেন্দ্র নির্ব্বিকল্পভূমিতে আরোহন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, শিষ্যেরা অনেকেই ধ্যানে বসিয়াছেন, কেহ কেহ রামকৃষ্ণদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, কেহ বা দূরে বাগানের এক কোণে নিম্নস্বরে ভগবৎ-সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। নরেন্দ্র ও গোপালদা' নামে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক একজন এক গৃহে ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়াছেন। সহসা একটা কাতর চীৎকার শব্দে গোপালদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ণে গেল যেন নরেন্দ্র বলিতেছেন—"গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল ?" গোপালদা ত্রস্তে দৌড়াইয়া গিয়া নরেন্দ্রের শরীরের স্থানে স্থানে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন "কেন নরেন, এই যে !" কিন্তু নরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল যে তাঁহার মস্তকটি মাত্র আছে আর কিছুই নাই। গোপালদা তো কিছু বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আর সকলকে সাহায্যার্থ ডাকিতে লাগিলেন। সকলে দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে, তিনি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারাও কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন উপরের ঘরে পরমহংসদেবকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি শয়ন করিয়াছিলেন। ঘটনাটি শুনিয়া ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী সহকারে বলিলেন, "বেশ হয়েছে, থা'ক্ খানিকক্ষণ ঐরকম হ'য়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুলেছিল !"

রাত্রি একপ্রহর এইভাবে কাটিয়া গেলে, নরেন্দ্র ক্রমশঃ সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তাহার পর ধীরে ধীরে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে গেলেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই। সোপানশ্রেণী, অতিক্রম করিবার সময় চরণদ্বয় চলিতেছে কিনা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। পরমহংসদেব তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে! চাবি কিন্তু আমার

হাতে রইল। এখন তাকে কাজ ক'ত্তে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুল্‌বো।" তারপর তিনি তাঁহাকে শরীরের প্রতি অযত্ন করার জন্য মৃদু ভৎর্সনা করিয়া আহার ও সঙ্গী নির্ব্বাচন বিষয়ে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন।

সমাধি হইতে ব্যুথানকালে কিরূপ অবস্থা হয় তাহার পরিচয় আমরা কতকটা পাইলাম। কিন্তু সমাধিকালে অন্তরে কিরূপ অনুভূতি হয় সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই হয় না। স্বামিজী স্বয়ং "নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" এই গানটিতে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। তবে সেদিনকার ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল। তিনি শয়নাবস্থায় ধ্যান করিতেছিলেন, হঠাৎ অনুভব করিলেন যেন মস্তকের পশ্চাদ্দেশে উজ্জ্বল আলোকরাশি প্রজ্জলিত হইয়াছে। ক্রমে সেই আলোক আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইতে লাগিল যেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশ নয়ন-সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইতেছে, বিশ্বসংসার টলিতেছে, ক্রমে মন একেবারে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গিয়া এক অখণ্ড জ্যোতিঃ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল। দেশ কাল পাত্রের আর কোনও বোধ রহিল না; শুধু ব্রহ্মসত্তা ভাসিতে লাগিল। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "সেদিন দেহাদি বুদ্ধির এককালে অভাব হয়েছিল। প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধি কালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের'ভেদ চ'লে যায়—সব এক হ'য়ে যায়, —যেন মহাসমুদ্রে—জল জল—আর কিছুই নাই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।" সমাধি অবস্থা হইতে নীচে নামিয়া আসার পর তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন মস্তক ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি সেই অবস্থায় গোপালদাকে ডাকিয়াছিলেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ধ্যানাবস্থা কিরূপ পরিপক্কতা লাভ করিয়া

ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে অবগত হইতে পারা যায়। একদিন স্বনামধন্য বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ে এক বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়াছিলেন, কিন্তু সেস্থলে এত মশকের উৎপাত ছিল যে গিরিশবাবু কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে মশক দংশনে অস্থির হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা-মাত্র তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন তাঁহার শরীরের উপর এত অধিকসংখ্যক মশক বসিয়া আছে যে, বোধ হইতেছে যেন তিনি একখানি কৃষ্ণবর্ণের কম্বল দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে গিরিশবাবু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। তারপর পা ধরিয়া ঘন ঘন ঠেলিতে লাগিলেন, তাহাতেও নরেন্দ্রের চৈতন্য হইল না। অবশেষে যখন গিরিশবাবু নরেন্দ্রের আসন ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্যহীন দেহ ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহা মৃতদেহবৎ কঠিন এবং সম্পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য। ইহার অনেকক্ষণ পরে তিনি বাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তিনি নরেন্দ্রকে আপন সকাশে ডাকিতেন ও অন্যান্য শিষ্যগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ নরেন্দ্রকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিতেন। নরেন্দ্র, তিনি শীঘ্রই পাপপূর্ণ মর্ত্তালোক ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া সময়ে সময়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেন। দেহ-ত্যাগের তিন চারি দিবস পূর্ব্বে একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন ও সম্মুখে বসাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া সমাধিস্থ

হইয়া পড়িলেন। স্বামীজি বলিতেন, তখন তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল যেন পরমহংসদেবের শরীর হইতে তড়িৎ-কম্পনের মত একটা সূক্ষ্ম তেজঃরশ্মি তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কতক্ষণ এইভাবে ছিলেন তাহা তাঁহার মনে ছিল না। বাহ্য-চেতনা হইলে দেখিলেন, পরমহংসদেব অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন! তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পরমহংসদেব সস্নেহে বলিলেন 'আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফকীর হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ কর্‌বি। কাজ শেষ হ'লে পর ফিরে যাবি।' নরেন্দ্রও কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তর ভাবপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছিল না। তিনি বালকের ন্যায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

লীলাবসানের দুই দিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে আপন সকাশে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'দেখ্ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফি'রে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা কর্‌বি।' নরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটিও বাক্য নির্গত হইল না। শুধু ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই কি প্রভুর শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? হায় হায়, এতদিনে সব শেষ হইতে চলিল! ঐরূপ একদিন পরমহংসদেব এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "নরেন লোক শিক্ষা দিবে।" কিন্তু নরেন্দ্র, এই আদেশ পালন করিতে সমর্থ হইবেন কিনা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি পার্‌বো না।" তাহাতে পরমহংসদেব জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, "কত্তেই হবে, তোর ঘাড় ক'র্‌বে।"

অতিলৌকিক বিষয়ে নরেন্দ্রের এত অধিক সন্দেহ এবং ঐ সকল পরীক্ষা

করিবার আগ্রহ তাঁহার এরূপ প্রবল ছিল যে, পরমহংসদেবের শেষ মুহূর্ত্তে যখন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উন্মুখ হইয়াছে তখনও তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন "আচ্ছা উনি তো অনেক সময়ে নিজকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই সময়ে যদি বল্‌তে পারেন 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।" কি আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্ত্তে নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে পরমহংসদেব তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হোলো না? সত্যি সত্যি বল্‌ছি, যে রাম যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়!" এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে নরেন্দ্র এত বিস্মিত হইলেন যে, যদি সে সময়ে কক্ষমধ্যে বজ্রপাতও হইত তথাপি বোধ হয় তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। এরূপ দেবদুর্লভ মহাপুরুষকে এতদূর ক্ষুদ্র সন্দেহের পাত্র মনে করায় তখন তাঁহার অন্তরে বিষম অনুতাপের উদয় হইল এবং তিনি অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

* * *

ইহার দুই দিবস পরে পরমহংসদেব লীলা সংবরণ করেন। অধ্যাত্মরাজ্যের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে অস্তমিত হইল।

* * *

আমরা এখানে পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। কারণ তিনি যে কি ছিলেন তাহা কোনও কালে কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। স্বয়ং স্বামিজী পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন "লোকে ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলে—সে সব partial truth (আংশিক সত্য) মাত্র। যে যেমন আধার সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে আলোচনা

কচ্ছে। ঐরূপ করাটি মন্দ নয়। তবে তাঁহার ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেউ বুঝে থাকেন, যে তিনি যা বুঝেছেন বা বলেছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বল্‌ছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেহ বল্‌ছেন—চৈতন্যদেব নারদীয় ভক্তিপ্রচার কত্তে জন্মেছিলেন, কেহ বল্‌ছেন—সাধন ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেহ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহীভক্তদের মুখে শুন্‌বি,—ওসব কথায় কাণ দিবি নি। তিনি যে কি, কত কত পূর্ব্বগ অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনব্যাপী তপস্যা ক'রেও একচুল বুঝ্‌তে পাল্লুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হ'য়ে বল্‌তে হয়। যে যেমন আধার তাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপূর ক'রে গেছেন, তাঁর ভাবসমুদ্রের একবিন্দু উচ্ছ্বাসের ধারণা কত্তে পেলে মানুষ তখনই দেবতা হ'য়ে যায়। সর্ব্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়?—এই থেকেই বোঝ্‌ তিনি কে দেহ ধ'রে এসেছিলেন। অবতার বল্লে তাঁকে ছোট করা হয়!"

* * * *

পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ আরও কয়েকদিন কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করিলেন, কারণ যে সময়ের জন্য বাগান ভাড়া লওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইতে আরও এক সপ্তাহ বাকী ছিল। সন্ন্যাসী-শীষ্যদিগের সকলেই দিনে একবার করিয়া সেখানে যাইতেন, কেহ কেহ বা দিবারাত্র সেখানে থাকিতেন। তবে সন্ধ্যার পর অনেকেই সেখানে উপস্থিত হইয়া ধ্যান-ধারণা, পরমহংসদেব সম্বন্ধে কথোপকথন, তাঁহার পূজা ও ধর্ম্মসঙ্গীতাদিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন। শ্রীগুরুর অদর্শনে তাঁহাদের প্রাণে যে

বিষম বেদনা জাগিতেছিল তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখনই দুইজন একত্র হইয়াছেন, অমনি তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা, কখনও বা যে গৃহে তিনি ছিলেন তাহার মেজেতে গড়াগড়ি—এইরূপে কয়েক দিন কাটিল। গৃহী শিষ্যেরাও আসিতেন, তাঁহাদেরও ঐরূপ ভাব। সে স্থানের প্রতি ধূলিকণাতে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের স্মৃতি ও প্রভাব বিরাজ করিতেছিল।

তাঁহার তিরোধানের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন রাত্রে নরেন্দ্র ও তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা চিন্তামগ্ন-ভাবে একত্রে উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উভয়েরই নেত্রপথে পতিত হইল।—একি ?—এ যে শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতিচ্ছবি! দুইজনেই ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র উহা তাঁহার নিজের ভ্রান্তিদর্শন হইতে পারে—এই আশঙ্কায় বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কিন্তু যখন তাঁহার গুরুভ্রাতাটি বলিয়া উঠিলেন "নরেন, দেখ দেখ!"—তখন তাঁহার সংশয় দূর হইল।—বুঝিলেন সত্যই তিনি জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন দিয়াছেন। তখন তাঁহারা আর সকলকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিতে আসিতেই সহসা সেই জ্যোতির্মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার ভস্মাবশেষ ও অস্থি একটি তাম্রকলসে রক্ষা করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেই ঘরে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া এই সময়ে তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীদের ইচ্ছা ঐগুলি গঙ্গাতীরেই সমাহিত করা হয়, কারণ তিনি গঙ্গাতীর ভাল-বাসিতেন; কিন্তু গৃহীরা বলিলেন—প্রথমতঃ, গৃহী ব্যতীত আর কাহারও

ঐগুলিতে অধিকার নাই, দ্বিতীয়তঃ, অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসীরা নিঃসম্বল, তাঁহাদের নিজেদেরই মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, উহার উপর আবার ঐ সব অস্থি ও ভস্মাবশেষ রাখিবেন কোথায় ? সুতরাং তাঁহারা ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্ররোচনায় ঐগুলি কাঁকুড়গাছির উদ্যানে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সন্ন্যাসীরা—বিশেষতঃ শশী ও নিরঞ্জন মহারাজ কিছুতেই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুতরাং উভয়পক্ষে ক্রমশঃ বিষম কলহের সূত্রপাত হইল। এই গোলযোগের সময়ে নরেন্দ্র মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গৃহীদিগকে 'অস্থি দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন এবং সকল সন্ন্যাসী-ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন 'তোরা কি মনে করিস্ ঠাকুরের দেহাবশেষ অধিকারে থাকিলেই তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হওয়া যায়, না উহাই তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ? যদি আমরা তাঁর প্রকৃত শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাঁর দেহাবশেষ লইয়া বিবাদ করা অপেক্ষা বরং আমাদের উচিত তাঁর উপদেশানুযায়ী জীবন গঠন করা। আয়, আমরা সেই চেষ্টা করি।' এই কথায় সকলে সম্মত হইলে, স্বামীজি অপর সকলের সহিত একত্রে দেহাবশেষ-পাত্রটী নিজশিরে বহন করতঃ কাঁকুড়গাছির উদ্যানে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে উহার অভ্যন্তরস্থ পূত দেহাবশেষের অর্দ্ধাংশেরও অধিক বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অল্পদিন পরে উহা মঠে লইয়া গিয়া নিত্য সেবা-পূজার ব্যবস্থা করা হয়। অনন্তর চতুর্দ্দশবর্ষ পরে উহা স্বামীজি কর্তৃক মহা-মহোৎসবে বেলুড়মঠে আনীত ও তথায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা।

বাগানের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সময় অচিরে আগত হইল। এখন আর রামকৃষ্ণদেব নাই—সুতরাং যাঁহারা বাগানের ভাড়া দিতেছিলেন তাঁহারা বাগান ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় কি করা যায় সকলেরই মনে এই চিন্তার উদয় হইল। অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল, কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত হইল না; গৃহীদের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, "উহারা যে সাধারণ সাধুদের ন্যায় ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহা হইতে পারে না। উহারা এখনও বালক। সারাজীবন পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদিগের নিকট কত আশা ভরসা আছে। অতএব এদিক ওদিক ভাসিয়া বেড়ান অপেক্ষা উহারা বরং গৃহে ফিরিয়া যাউক।" কিন্তু সন্ন্যাসীরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। গৃহে ফিরিয়া যাওয়া?—অসম্ভব। রামকৃষ্ণদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাদের কয়েকজন বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহাদের পিতা, অভিভাবক ও আত্মীয়গণ এক্ষণে বুঝাইতে লাগিলেন যে, বি, এ, পাশ করিয়া যাহা হয় করা উচিত। যদি তাঁহারা সংসার না করিতে চাহেন তাহা হইলেও অন্ততঃ পাশটা করা উচিত, কারণ তাহাতে তাঁহা-দের মর্য্যাদা আরও বাড়িবে বই কমিবে না। এই ভাবের খুব পীড়াপীড়ি, প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন চলিতে লাগিল। বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পরীক্ষা দিতে বা পারিবারিক ব্যাপার শেষ করিয়া আসিবার জন্য পুনরায় গৃহে গমন করিলেন। ইচ্ছা—ঐগুলি শেষ হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

কিন্তু কয়েকজন সন্ন্যাসী ইতিমধ্যেই একপ্রকার গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোথায় যান—এই লইয়া গৃহীদের মধ্যে নানা বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে বলরাম বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এই চারিজনের একান্ত ইচ্ছা যে ঐ সকল যুবক সন্ন্যাসীরা একত্র মিলিত হইয়া একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন। কিন্তু অপর গৃহী ভক্তেরা বলিলেন যে, ঐরূপ করিলে পরিণাম ভাল হইবে না, কারণ টাকা কোথায়? যুবক সন্ন্যাসীরা তদুত্তরে বলিলেন "অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ পাইয়া ও তাঁহার জীবনে জ্বলন্ত বৈরাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া এখন কি আবার সংসারকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে যাইব? তিনি কি বলেন নি—'সন্ন্যাসী সঞ্চয়ের কথা ভাবিবে না', 'কাল কি খাইব' এ চিন্তা করিবে না। কে টাকা চায়? আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইব—তারপর তিনি আছেন।" যাঁহারা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাঁহারাও বলিলেন, "আমাদেরও যেই পরীক্ষা শেষ হইবে অমনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিব।" এই সকল ত্যাগী যুবকের এবংবিধ দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সজলনয়নে কহিলেন "ভাই রে! তোরা কোথায় যাবি? তোদের কোথাও যেতে হবে না, বা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্ত্তে হবে না। আমরা যে কয়জন গৃহীভক্ত আছি, যা পারি সামান্য কিছু দিয়ে একটা বাড়ী ভাড়া কর্ব্বো, তোরা সব সেখানে থাক্‌বি। আমরাও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে সংসারের জ্বালা জুড়াব। আমি ত কাশীপুরের বাগানের দরুণ আগে কিছু কিছু দিতাম, সেটা আর বন্ধ কর্‌বো না। তাতেই একটা ছোট বাড়ী নিয়ে তোরা থাক্‌বি, আর যা জুটবে তাই খেয়ে সাধন-ভজন কর্‌বি,—ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াতে পাবি না।"

সুরেন্দ্রবাবু একজন অদ্ভুত হৃদয়বান্ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে আদর করিয়া 'দানা' (অর্থাৎ শিবানুচর) বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহার উপরোক্ত কথানুসারে বরাহনগরে একটি বাটী ভাড়া লওয়া হইল। বাড়ীটি অনেকদিনের পুরাতন ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বহুদিন হইতে লোকজন না থাকাতে উহা 'পড়ো বাড়ীর' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, এমন কি তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অপবাদ ইহার রটিয়াছিল। লোকে বলিত ঐ বাড়ীতে ভূত আছে। সে যাহা হউক বাড়ীটি যে অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় বহুবৎসর পড়িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন লোকে ভাড়া দিয়া সেখানে থাকিতে সম্মত হইত না—ভয়, পাছে ছাদ খসিয়া ঘাড়ে পড়ে! রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের ভূত বা মৃত্যুর ভয় বিশেষ ছিল না। তাঁহারা দেখিলেন বাড়ীটির ভাড়া কম, আর গঙ্গার নিকটে—অথচ সহরের গোলমাল হইতে অনেক দূরে, ধ্যান-ধারণার কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই আশ্রম ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত এইখানেই ছিল এবং ইহারই নাম 'বরাহনগর মঠ'।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে মঠটি গঠিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীদের কেহ না কেহ স্থায়ীভাবে এখানে থাকিতেন, কেহ বা দিনকতকের জন্য তীর্থভ্রমণে যাইতেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া এইখানেই থাকিতেন। যাঁহারা গৃহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য গিয়াছিলেন তাঁহারাও প্রায় প্রত্যহ এখানে সমাগত হইতেন। নরেন্দ্র এই দলের প্রধান ছিলেন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলার জন্য তিনি একেবারে সংসার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে গৃহে গিয়া সাংসারিক অভাব-অভিযোগ শ্রবণ ও নিবারণের চেষ্টা

করিতে হইত। তবে দিবসের অধিকাংশ এবং রাত্রিটা মঠেই কাটাইতেন। এই যে এতগুলি যুবক সন্ন্যাসী একত্র মিলিত হইয়া একটা নবসঙ্ঘে পরিণত হইল, ইহার প্রধান উদ্যোক্তাই নরেন্দ্রনাথ। তিনিই ইহার পরিচালক, উৎসাহদাতা ও কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। সংসারের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও তিনি এক মুহূর্ত্ত মঠের চিন্তা হইতে বিরত ছিলেন না। ক্রমে তাঁহার সাংসারিক গোলযোগ মিটিয়া আসিল। যখন দেখিলেন ঝঞ্ঝাট চুকিয়াছে, তখন তিনি, যাঁহারা জানুয়ারীতে পরীক্ষা দিবেন বলিয়া গৃহে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে মঠে আকৃষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। দিবসের মধ্যে কখন কাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইতেন তাহার কিছু স্থিরতা ছিল না। সকলেই তাঁহার আগমন-ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরীক্ষার জন্য পাঠাভ্যাস করিতেন, কিন্তু তিনি একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপর্য্যুপরি করাঘাত করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বাধ্য করিতেন। সেখান হইতে তাঁহাদিগকে রাজপথে টানিয়া লইয়া গিয়া অভিভাবকদিগের অসাক্ষাতে ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেন—"তোরা সব কি জীবনটা একজামিন্ দিয়েই কাটাবি ঠিক করেছিস্? এই কি তাঁর উপদেশ পালন করা! এই কি তাঁর মনোমত কার্য্য! এই জন্যই কি তিনি এত কষ্ট সহ্য করে গেলেন! সন্ন্যাসী হয়েছিস্, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিস্, তবু একজামিন্ পাস্ করে সংসারের উন্নতিকামনা করিস্? ত্যাগ ও ভোগবাসনা কি একসঙ্গে থাক্‌তে পারে? ধিক্ তোদের! শীগ্‌গির ওসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মঠে চল্।" এবম্প্রকার ভৎর্সনা বাক্যে, কখনও বা ধীরভাবে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে মঠে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়

গুরুভাইদের পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত ও সংসার-কামনার ক্ষীণ বীজ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাইত। তাঁহারা নরেন্দ্রের বাক্যে অনুতপ্ত হইয়া পাঠাদি ত্যাগ করিয়া মঠে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দুই একদিন থাকিয়াই আবার গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। পুনরায় নরেন্দ্র পূর্ব্ববৎ প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া অগ্নিময়ী ভাষায় সকলের প্রাণে বৈরাগ্য-বহ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ গুরুভ্রাতাদিগের মন টলিল। সংসার-ত্যাগের সংকল্প সুদৃঢ় হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, যাহারা পারমার্থিক পথের পথিক, যাহারা ইন্দ্রিয়রাজ্য ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের জন্য অগ্রসর, তাহাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য অতি সামান্য, সাংসারিক বিদ্যাশিক্ষা অতি হেয়! সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পরীক্ষায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন ও একে একে মঠে আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন।* ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে তাঁহারা সকলেই

* এইরূপ মন পরিবর্ত্তনের আর একটি প্রধান কারণ আঁটপুরের ঘটনা। ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রেমানন্দ স্বামীর মাতা স্বীয় আঁটপুরের বাটীতে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। এখানে তাঁহারা কয়েক দিবস একত্রে সঙ্কীর্ত্তন, ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া এরূপ মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন যে, অতঃপর আর বাটীতে ফিরিয়া না গিয়া মঠেই অবস্থান করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। আঁটপুরে একদিন স্বামীজি এরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় খৃষ্টমাহাত্ম্য বর্ণনা করেন যে, সকলে একেবারে সেই মহাপুরুষের ভাবে তন্ময় হইয়া যান। দৈবক্রমে সেদিন যীশুখ্রীষ্টের জন্ম দিবসের অধিবাস রজনী (Christmas eve)। কিন্তু প্রথমে তাহা কেহই জানিতেন না। পরে যখন জানিতে পারিলেন তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন ঐদিনে অজ্ঞাতসারে এরূপ আলোচনা নিশ্চয়ই বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট ঘটনা। সেই দিন হইতে তাঁহাদের সকলের মনে সঙ্ঘগঠনের বাসনা দৃঢ়বদ্ধ হইল।

একেবারে গৃহ ছাড়িয়া মঠে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহ-সংসার সব ভাসিল,—আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগকে নূতন পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

দৃপ্ত সিংহের ন্যায় তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য তাঁহাদের হৃদয়কে আপনার বিপুল শক্তি সাহায্যে বজ্রবৎ দৃঢ় করিয়া গঠিত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর জীবন বড় কঠোর! সুখের ক্রোড়ে লালিত এই সকল ভদ্রসন্তানেরা যাহাতে ত্যাগমার্গের দাবদাহ সহনে অসমর্থ হইয়া দুর্ব্বলচিত্তে পলায়ন না করেন তাহার জন্য তিনি অশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহাদের মনকে বলীয়ান্ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সানন্দে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন, যে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই হস্তে তাঁহাদিগের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার উপর ঠাকুরের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া নরেন্দ্রের নিজেরও এমন একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, কেহই তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিত না। তাঁহার গমনভঙ্গী, চক্ষুর মোহিনী শক্তি, ওজস্বিনী ভাষা ও প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল দর্শকমাত্রেরই প্রাণে স্বতঃই তাঁহার উপর একটা নির্ভরতার ভাব আনিয়া দিত। গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ মনে করিতেন "নরেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেই ঠাকুর সন্তুষ্ট হইবেন", কেহ ভাবিতেন 'ইনি তাঁহারই প্রতিনিধি।' কিন্তু নরেন্দ্র তাঁহাদিগকে সহোদরতুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সতত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে বেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। তবে প্রয়োজন হইলে কঠোর অস্ত্রও প্রয়োগ করিতে জানিতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে নবগঠিত সঙ্ঘ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। নরেন্দ্র হইলেন তাহার অধিনায়ক।

মঠ স্থাপনার পরেও মাঝে মাঝে ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগের অভিভাবকেরা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া

লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা কখনও কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দনাদি করিতেন, কখনও বা ভয় দেখাইতেন ও শাসাইতেন এবং সকল দোষ নরেন্দ্রের স্কন্ধে চাপাইয়া বলিতেন—'এই ছোঁড়া হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। এরা সবাই বাড়ী গিয়ে দিব্যি পড়াশুনো কর্‌ছিল, এ-ই ওদের টেনে-হিচ্‌ড়ে এখানে নিয়ে এলো, আর যত কু-পরামর্শ দিতে লাগ্‌লো! এরূপ অভিযোগ শুনিয়া নরেন্দ্র ও অপরাপর সন্ন্যাসীরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেন না এবং নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাদের মনঃক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে শেষে বলিতেন, "আমরা গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখন ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।" শশীর পিতা যখন শশীকে গৃহে ফিরিবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যে একবার সংসার ছেড়ে এসেছে, তার কাছে সংসার বাঘের বাসা।"

অগত্যা অভিভাবকেরা তাঁহাদের চিত্তের দৃঢ়তা ও অটল অধ্যবসায় দর্শনে তাঁহাদের গৃহপ্রত্যাগমন বিষয়ে একরূপ নিরাশ হইয়া ঐরূপ চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠ বরাহনগরে ও ১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটস্থ আলমবাজারে ছিল। সেখান হইতে কিছুদিনের জন্য বরাহনগরের অপর-পারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানে উঠিয়া যায় ও পরিশেষে স্থায়ীভাবে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মঠ-স্থাপনার পর হইতে এই সকল যুবকগণের মধ্যে প্রীতিবন্ধন ও ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং কঠোর অনল-পরীক্ষার মধ্যে দিন দিন তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল।

সে কি ভীষণ পরীক্ষা! আহারের কোন সংস্থান নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, দাসদাসী কিছুই নাই, হস্তে অর্থও নাই; ভিক্ষায় অনভ্যস্ত, দানগ্রহণে পরাঙ্মুখ, কাহারও নিকট বিশেষ সাহায্যেরও কোন প্রত্যাশা নাই—এইরূপ অবস্থার মধ্যে এই সকল তেজস্বী যুবক হৃদয়ের বল মাত্র সম্বল লইয়া, প্রভুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলেন। এ সাধনা শুধু স্ব-স্ব মুক্তিকামনায় নহে। পাঠক দেখিবেন, এ সাধনায় ভারতের—শুধু ভারতের কেন—সমগ্র জগতের কল্যাণসাধন নিহিত রহিয়াছে।

৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাক-নাম 'সুরেশবাবু') এই মঠের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ন্যায় মহদন্তঃকরণ লোক এ জগতে দুর্লভ। মঠের এই সকল যুবকদিগকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। যাহাতে ইঁহাদিগের কোন অভাব-অসুবিধা না হয় তদ্বিষয়ে তিনি সতত লক্ষ্য রাখিতেন এবং কায়মনোবাক্যে ও অর্থদ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বরাহনগরের মঠের ভাড়া তিনিই বহন করিতে স্বীকৃত হন, পূর্ব্বে একথা বলিয়াছি। মঠ স্থাপিত হইলে তিনি গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে মঠে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন "আমি তোমার সংসারের সব খরচ নিজের ঘাড়ে লইলাম, তুমি মঠে থাকিয়া মঠের গৃহকর্ম্মাদি করিবে এবং প্রত্যহ বা একদিন অন্তর আমার নিকট আসিয়া মঠের ভাইদের খবর দিবে। বিশেষ করিয়া এইটি মনে রাখিও যে, যখনই তাঁহাদিগের খাদ্যাদির অভাব দেখিবে তখনই যেন তাহা আমার কর্ণগোচর হয়।" গোপাল পরমহংসদেবকে জানিত ও নরেন্দ্রকে বড় ভালবাসিত। তাহার দুইটি অল্পবয়স্ক ভ্রাতা ও বিধবা মাতার জন্য সে পূর্ব্বে মঠে যোগ দিতে পারে নাই। সুতরাং এখন সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দসহকারে মঠে আসিয়া বাস ও তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য

করিতে লাগিল। সে যখনই দেখিত যে ব্যাপার সুবিধা নয়, তখনই সুরেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিত। "আজ সমস্ত দিন মঠে উপবাস গিয়াছে" কি "কাল রাত্রি হইতে সকলে অনাহারে আছেন", এইরূপ এক একটা খবর লইয়া যখন সে সুরেশবাবুর নিকট উপস্থিত হইত, তখন তিনি অবিলম্বে তাহাকে টাকা দিয়া বাজারে পাঠাইতেন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মঠে লইয়া যাইতে বলিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া দিতেন যেন একথা প্রকাশ না হয়, কারণ তিনি জানিতেন কথাটা প্রকাশ হইলে মঠের ভাইরা আর কখনও তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। গোপাল এই সকল জিনিষপত্র লইয়া মঠে উপস্থিত হইত, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন কোথা হইতে সে সব আসিল। গোপালও চতুরতার সহিত উত্তর দিত "ওঃ, এ সব একজন ভদ্রলোক পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত কিছুতেই নেবো না, কিন্তু তিনি ভারী পীড়াপীড়ি কর্ত্তে লাগ্‌লেন,—কি করি, কাজে-কাজেই নিয়ে আস্‌তে হলো।' মঠের ভাইরা আশ্চর্য্য ভাবিতেন 'প্রভুর মহিমা কে বুঝিতে পারে! তিনি কাহাকে দিয়া কি কার্য্য করাইতেছেন তাহা আমরা কি বুঝিব?'

ধন্য সুরেন্দ্রনাথ—ধন্য তোমার প্রেম! সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বামীজি স্বয়ং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "সুরেশবাবুর নাম শুনেছিস্ ত? তিনি এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগর মঠের সব খরচপত্র বহন কর্ত্তেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাব্‌তো। তাঁর ভক্তি-বিশ্বাসের তুলনা হয় না।"

বরাহনগর মঠে তপস্যা।

বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রকৃত একনিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে প্রত্যহ যে কি সুখের হিল্লোল প্রবাহিত ও আনন্দের কলতান উত্থিত হইত তাহা লেখনী কি ব্যক্ত করিবে! সূর্য্যোদয় অবধি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিরাম সংকীর্ত্তন হইতেছে, কাহারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিবোধ বা বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা নাই। ব্যাকুল ঈশ্বর-দর্শনলালসা দাবাগ্নির ন্যায় প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রজ্বলিত, নরেন্দ্রাদি কেহ কেহ প্রায়োপবেশনে তনুত্যাগ করিতেও কৃতসংকল্প। যে দিন যেমন জুটিত সে দিন সেইরূপ আহার হইত। স্বামীজি স্বয়ং এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছুই নাই, ভাত জোটে ত নুন জোটে না। দিনকতক হয়ত শুধু নুন-ভাত চল্‌লো, কিন্তু কাহারও গ্রাহ্য নাই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাস্‌ছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন-ভাত,—এই মাসাবধি চল্‌ছে। আহা সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখ্‌লে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি?"

খাওয়া-দাওয়ার ত এই অবস্থা। তার উপর লোকজন নাই, সুতরাং ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, জল তোলা—এমন কি মাঝে মাঝে রন্ধনাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্য নিজেদেরই করিতে হইত। প্রত্যেকেই অপরের পরিবর্ত্তে স্বয়ং কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত। কার্য্যের মধ্যেই আবার দিবারাত্র ধর্ম্ম, দর্শনাদির আলোচনা চলিতেছে, এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, আদৌ আহার জুটে নাই অথচ ধর্ম্ম-

প্রসঙ্গেরও বিরাম নাই। তাহার মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! পরিধানের জন্য প্রত্যেকের একখানি কৌপীন ও এক টুকরা গেরুয়া বস্ত্র। আর সর্ব্বসাধারণের জন্য একখানি মাত্র সাদা কাপড় ও একখানি চাদর দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান থাকিত, যাঁহার যখন বাহিরে যাইবার আবশ্যক হইত তিনি তখন উহা ব্যবহার করিতেন। গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণের মধ্যে একখানি চাদর ঢাকা মাদুর—তাহার উপর রাত্রিতে শয়নকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, গুটিকতক জপের মালা ও দেওয়ালের গায়ে দুই চারিখানা ঠাকুর-দেবতার ছবি ও একটা তানপুরা, আর প্রায় শতখানেক সংস্কৃত বাঙ্গালা ইংরাজী কেতাব—এ গুলি ভক্ত বন্ধুদিগের প্রদত্ত উপহার।

তখন স্বামীজি একদমে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতেন। কাজ করিতে করিতে যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া অপর সকলকে জাগ্রত করিবার জন্য "জাগো জাগো সবে অমৃতের অধিকারী" গানটি গাহিতেন। তারপর সকলে ধ্যান করিতে বসিতেন এবং বেলা দ্বিপ্রহর বা ততোধিককাল পর্য্যন্ত ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিতেন। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে হইতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠিত। জোয়ান অব আর্ক ও ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতির গল্প হইত। কখন কখন স্বামিজী কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব' নামক গ্রন্থ হইতে সুদীর্ঘ অংশসমূহ আবৃত্তি করিতেন এবং সকলে সমস্বরে দুলিতে দুলিতে 'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক' 'সাধারণ তন্ত্রের জয় হোক'—এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে শশী মহারাজ তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া স্নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা আবার একত্র হইতেন, আবার ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ চলিতে চলিতে

সন্ধ্যা হইয়া যাইত এবং তৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুই ঘণ্টাব্যাপী আরাত্রিক সম্পন্ন হইত। তাহার পর মধ্যরাত্র বা তাহারও পর পর্য্যন্ত সকলে একত্রে ছাদে বসিয়া 'সীতারাম' নাম গান করিতেন। গভীর রাত্রে এবম্প্রকার উচ্চধ্বনিতে সময় সময় প্রতিবেশিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই—তাঁহারা তখন আপন ভাবেই তন্ময়।

প্রথম প্রথম মঠের সন্ন্যাসীরা প্রচার কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরলাভই তখন তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার পর যদি আবশ্যক হয়, তবে পরমহংসদেবের ন্যায় নীরবে পরোক্ষভাবে আপনাদের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রচার কার্য্য করিবেন, এইরূপ সংকল্প ছিল। এই ভাবটী নরেন্দ্রই তাঁহাদের মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন যে, অপরকে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে নিজে উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, প্রথমে নিজেদের লাভ করিতে হইবে, তারপর অপরকে দান, কিন্তু সময়ে সময়ে প্রচারকের ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। তখন তিনি বলিতেন, "সকলেই প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারা না জানিয়া প্রচার করে, আমি সেটা জানিয়া করিব। এমন কি' তোরা যে আমার গুরু ভাই, তোরাও যদি তার প্রতিবন্ধক হ'স তবুও আমি ছাড়ব না, দীনহীন চণ্ডালের কুটীরে পর্য্যন্ত গিয়ে প্রচার করে আসব।" তিনি বলিতেন 'প্রচারের অর্থ প্রকাশ (expression)—এই দেখ ত্রৈলঙ্গস্বামী; দিনরাত বিশ্বেশ্বরের চরণে পড়ে রয়েছেন, মুখে একটি কথা নেই, জিজ্ঞাসা কল্লে কোন উত্তর দেন না। তবু কি ভাবিস্, তিনি কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন না? মৌনই তাঁর প্রচার। এই মৌনভাষায় তিনি জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তার সাক্ষী দেখ, গাছপালা গুলো পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী বর্ণনা করিতেন—"এক রাজা একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ কি? সাধুটী কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। রাজা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন অসহিষ্ণু ভাবে পুনরায় ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সাধু উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমি ত অনেকক্ষণ হইতে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, কারণ নীরবতাই তাঁহার লক্ষণ।'"*

উপরোক্ত উপদেশমতে সন্ন্যাসীরা নির্জ্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেন।

বস্তুতঃ সে সময়ে বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রপ্রমুখ রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা যে উৎকট সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার তুলনা জগতে অতি বিরল। যাঁহারা মঠে সে সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও বলেন, "সে যে কি কঠোর তপস্যা তাহা মুখে কি বলিব? সে কঠোরতা সহ্য করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।" অথচ সন্ন্যাসীরা নিজে তাহাকে বড় বিশেষ কঠোর বা কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, বা তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন "ওঃ! ঠাকুরের কি অদ্ভুত বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা ছিল! তিনি যা দেখাইয়াছেন আমরা তার এক আনাও করিতে পারিতেছি না। হায় হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা কি অপদার্থ!" কিন্তু বাস্তবিক নরেন্দ্রের কার্য্য দেখিলে তখন মনে হইত, তিনি তপস্যানলে আপনাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, মনে হইত যেন তাঁহার অন্তরের প্রবল ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর-সন্দর্শন-তৃষ্ণা দেহপিঞ্জর ভগ্ন

---

* উপনিষদে আছে—বাহ্বঋষিকে ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "মৌনমেব ব্রহ্ম।"

করিয়া ফেলিবে। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধ্যানে বসিতেন এবং সমস্ত রাত্রি নিস্পন্দভাবে আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সে সময়ে অপর কেহ তাঁহার নিকট যাইতে সাহস পাইত না। যতক্ষণ অন্ধকার থাকিত তিনি আসনত্যাগ করিয়া উঠিতেন না। অবশেষে যখন পূর্ব্বদিক উষার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত তখন তিনি ধীরে ধীরে আসনত্যাগ করিয়া উঠিতেন, সমস্ত রাত্রি একাগ্রতা সাধনের অদম্য চেষ্টায় তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিত, মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিব্যাপ্ত ও প্রাণ অব্যক্ত পুলকে পরিপূর্ণ হইত।

অন্যান্য সাধুরাও এই দৃষ্টান্তের অনুকরণে কঠোর সাধনে নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পিপাসা মিটিত না, প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন 'হায় হায়! আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না।'

বাস্তবিক সে সময়ে মঠ-ভ্রাতারা দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবে তন্ময় থাকিতেন। এমন দিন বা সময় ছিল না যে সময়ে তাঁহার স্মৃতি একেবারে মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা এ সময়ে মঠে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা এই সকল সাধুদিগের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে ভাবিতেন, 'ইঁহারা কে?—চক্ষুঃ হইতে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছে, দেখিতে উন্মাদের মত!' বাস্তবিকই ইঁহারা ঈশ্বরের জন্য উন্মাদ হইয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিধ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ কয়েক প্রহর নিস্পন্দভাবে বসিয়া ভগবৎধ্যান করিতেছেন, কেহ বা অধ্যাত্মসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তরে চিদানন্দসুখ অনুভব করিতেছেন। স্বামীজি নিজে যেমন এ সকল বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন আর সকলকেও তেমনি উৎসাহ দিতেন। তাঁর নিজের জীবনটা এমন একটা আদর্শস্বরূপ ছিল যে, তাহার সম্মুখে থাকিলে কেহই জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারিত না। সময়ে

সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তাহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন ও জীর্ণবস্ত্রখণ্ডের ন্যায় দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ-লোকে চলিয়া যাইবেন। সে সময়ে তাহাদের নিকট জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মৃত্যুই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ কেহ শ্মশানে রাত্রিযাপন করিতেন ও চিতানলের শত শত লেলিহান জিহ্বাস্পর্শে কেমন করিয়া এ নশ্বর মানবদেহের শেষ চিহ্ন চিরদিনের মত ধরাবক্ষ হইতে লুপ্ত হয়, তাহা দেখিতে দেখিতে মৃত্যুচিন্তা হইতে ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। কেহ কেহ জগন্মাতার রূপ দর্শন না করিয়া ছাড়িব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতেন। কেহ সারাদিন সারারাত মালাই জপিতেছেন, আবার কেহ বা সত্যলাভের দৃঢ়সংকল্প লইয়া প্রতি রজনী একটা প্রকাণ্ড ধুনি জ্বালাইয়া তাহার নিকট বসিয়া থাকিতেন।

এই ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ যখন দেখিতেন যে, গুরুভ্রাতারা অত্যন্ত কঠোর অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, এমন কি তাহাতে শরীরের অনিষ্ট সম্ভাবনা, তখন বলিতেন "তোরা কি মনে করেছিস্ সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি?—তা হয় না রে! রামকৃষ্ণ পরমহংস পৃথিবীতে একটাই জন্মায়—একবারই আসে।" কখনও বলিতেন "তাঁর মুখে পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের কথা শুনেছিস্ ত? তোরা হচ্ছিস্ সেই পিঁপড়ে আর ভগবান্ চিনির পাহাড়। তোদের এক একটা দানা পেলেই পেট ভ'রে যায়, কিন্তু মনে কচ্ছিস্ পাহাড়টা শুদ্ধ টেনে নিয়ে যাবি।"

উপরোক্ত সাধন ব্যতীত মঠে প্রত্যহ মন্ত্রপাঠের সহিত ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া, ঠাকুরের পূজা হইত। সন্ধ্যার সময় তাঁহার আরাত্রিক ও ভজনগান হইত; এবং শত অভাব-অনটনের

মধ্যেও তাঁহার নিত্যভোগের ব্যবস্থা ছিল। স্বামীজি কর্তৃকই এই পূজা প্রথম মঠে প্রবর্ত্তিত হয়।

সকলেই একযোগে মঠের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং স্বামীজি সকল কার্য্যেরই মূল উৎস ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় কেহ শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সমকক্ষ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "শশী ছিল মঠের প্রধান স্তম্ভ, সে না থাকিলে মঠ চলা অসম্ভব হইত।"

বাস্তবিক আর সকলে তীর্থপর্য্যটন বা তপস্যাদিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—কিন্তু শশী-মহারাজ ঠাকুর পূজা ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ ভক্ত জগতে দুর্লভ। তিনি ছিলেন একাধারে মঠের পাচক, পূজারী ও গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক। সকলে যখন ধ্যানধারণায় ব্যস্ত তখন তিনিই মঠের অত্যাবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ কাজগুলি সম্পন্ন করিতেন বা সকলকে জোর করিয়া স্নানাহারাদি করাইতেন। তিনি নিজেও জপধ্যান যথেষ্ট করিতেন কিন্তু মঠের গৃহকার্য্যগুলির উপর তিনি যতটা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন অপরে ততটা পারিতেন না। স্বামীজি বলিতেন "ওঃ, শশীর কি অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল! শশীই ছিল মঠের কেন্দ্রস্বরূপ। ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে ঠাকুরের ভোগ-রাগান্তে সকলের খাওয়া-দাওয়া যোগাড় করা থেকে, রাঁধা-বাড়া ও সকলকে খাওয়ান পর্য্যন্ত সব কাজ তাকে দেখ্‌তে হতো। আমরা ভোর ৩টার সময় উঠতুম, তারপর কেউ স্নান কর্ত্তো কেউ বা অমনিই ঠাকুরঘরে গিয়ে জপধ্যানে ব'সে যেতো। এমন অনেক দিন গেছে যে ভোর ৪।৫ টার সময় থেকে সন্ধ্যে ৪।৫টা পর্য্যন্ত জপধ্যান চ'লেছে। শশী আমাদের খাবার নিয়ে ব'সে থাক্‌তো, সময়ে সময়ে জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতো। তখন

আমাদের জপধ্যানে এত মন গিয়েছে, যে বিশ্ব থাক্ বা যাক্ কিছুই গ্রাহ্য নেই।”

এ তো গেল তপস্যা ও সাধন-ভজনের কথা। এ ছাড়া গুরুভাই-দিগকে কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্ত করিবার জন্য স্বামীজি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বরাহনগরের মঠে একটা বড় হলঘর ছিল, সকলে তাহাকে ‘দানাদের ঘর’ বলিত। সেখানে ধর্ম্ম, সঙ্গীত, দর্শন, ইতিহাস, জড়-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাদানুবাদ চলিত, গীতা উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ হইত, আবার ক্যাণ্ট, মিল, হেগেল, স্পেন্সার—এমন কি নাস্তিক ও জড়বাদীদিগের মতামতও পঠিত এবং সমালোচিত হইত। সে সভার সভাপতি ও প্রধান বক্তা ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা প্রায়ই এক-যোগে তাঁহার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করিতেন। তিনিও প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া সকলের যুক্তি খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাঁহারা তর্কে অসমর্থ হইলে আবার তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিতেন। যদি প্রশ্ন উঠিত ঈশ্বর আছেন কিনা, সভাপতি তর্কবলে প্রমাণ করিতেন ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, ওটা মনের কল্পনা মাত্র। আবার তিনিই কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমাণ করি-তেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। হয়ত শাঙ্করদর্শন সম্বন্ধে কথা উঠি-য়াছে, নরেন্দ্রনাথ শঙ্করকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আগাগোড়া দেখাইলেন শঙ্করের যুক্তিতে কত বহুবিধ দোষ বিদ্যমান। আবার তিনিই কিঞ্চিৎ পরে বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রমাণ করিতেন যে—শাঙ্করদর্শনই একমাত্র সত্যদর্শন এবং তাঁহার যুক্তিসমূহ অকাট্য। এইরূপে সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়-যোগাদি ষড়দর্শনই সভামধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইত। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণবদর্শন, তন্ত্র-পুরাণ, দেব-

দেবীর পূজা প্রভৃতি বিষয়ে বহুল তর্ক-বিতর্ক, তুলনা ও সমালোচনা চ'লত। সকল প্রসঙ্গ, সকল আলোচনা পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবে পরিসমাপ্ত হইত। নরেন্দ্রনাথ কথায় কথায় সম্পূর্ণ নূতন পথে গিয়া পড়িতেন ও সেখান হইতে দেখাইতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বর্ত্তমান হিন্দু জাতির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রভাব কতটা এবং সে প্রভাবের মূল্য কত। দেখাইতেন, যে ছিন্নমূল হিন্দু-ধর্ম্ম বাত্যাতাড়িত সমুদ্রবক্ষে কাণ্ডারীবিহীন জীর্ণতরীর ন্যায় ক্রমাগত ভাসিয়া চলিতেছিল, পরমহংসদেবের চরণস্পর্শে সেই তরী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে ও গন্তব্য-দিক্ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছে। তিনি বলিতেন "এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন তোরা বুঝ্‌তে পার্‌বি যে, লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য পরমহংসদেব কি করিয়াছেন!" এই সকল গুরুতর আলোচনার অবসরে মধ্যে মধ্যে 'গুরুগীতা', 'মোহমুদ্গর' বা ঐ জাতীয় অন্য কোন সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি বা 'প্রসাদ সঙ্গীত' কি 'শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত' গান করা হইত।

স্বদেশ বা সমাজ সম্বন্ধে কথা উঠিলে হয়ত কয়েকদিন তাহাতেই কাটিয়া যাইত। হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভ্যতার মূল কোথায়—সে সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ একটী বেশ উদার ধারণা জন্মাইয়া দিতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্রাট্ আকবর পর্য্যন্ত প্রত্যেক শক্তিশালী ভারতসন্তান কেমন করিয়া এদেশে জাতিগঠনের চেষ্টা করিয়াছেন ও তাহাতে কিরূপে ধীরে ধীরে জাতীয়জীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা তিনি আধ্যাত্মিকতার দিক্ দিয়া অতি বিশদভাবে বুঝাইতেন। ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, অনেক সময় মুসলমানজাতীয় কোন লোককে সম্মুখে দেখিবামাত্র শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিতেন। তাঁহার মনে হইত, সে ব্যক্তিও ভারতীয় সভ্যতা

ও সাধনার একটী অঙ্গবিশেষ। অনেক সময় আবার স্বদেশের ইতিহাস ব্যতীত অন্যান্য জাতির ইতিহাসও আলোচিত হইত। তাহার মধ্যে গিবনের 'রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতন' এবং কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লব'এর ইতিহাস প্রধান।

উপরোক্ত 'দানাদের ঘর' ব্যতীত মঠে আর একটী ঘর ছিল, সকলে তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'কালী তপস্বীর ঘর'। এই গৃহের দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া কালী (স্বামী অভেদানন্দ) দিনরাত সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন। তিনি এরূপ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন যে, সময়ে সময়ে দিবারম্ভ হইতে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অধ্যয়নের বিরাম থাকিত না। অনেকদিন মঠের ভ্রাতারা প্রাতঃকালীন ধ্যান-ধারণা সমাপনান্তে এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং স্বামীজীর সহিত বহু বিষয়ের আলোচনায় রত থাকিতেন, কখন বা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ঐরূপ করিতেন। এক একদিন এক একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত ও ঐ প্রসঙ্গ উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত চলিত। উদাহরণস্বরূপ এখানে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিব। মনে করুন একদিন বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ উঠিল। মঠের সকলেই প্রথমে 'ললিতবিস্তর' নামক পুস্তকখানি তন্নতন্ন করিয়া পাঠ করিলেন, পরিশেষে তাঁহাদের মন পুস্তকোক্ত বিষয়ের চিন্তায় এরূপ মগ্ন হইয়া গেল, যে তাঁহারা বর্ত্তমান ছাড়িয়া একেবারে অতীতে ডুবিয়া গেলেন। যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ভগবান্ বুদ্ধদেবের সহিত বুদ্ধগয়া হইতে রাজগৃহে বা সারনাথে চলিয়াছেন, বা বোধিবৃক্ষের তলে তাঁহার সত্যলাভ বা নির্ব্বাণদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ভগবান্ তথাগতের ত্যাগ-বৈরাগ্য তখন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাঁহারা কখনও তাঁহার চিতারোহণদৃশ্য

অনুভব করিয়া যেন আনন্দাদি বুদ্ধশিষ্যের সহিত অবিরল অশ্রুবর্জ্জন করিতেছেন, কখনও বা বোধ করিতেছেন যেন কুশীনগরের মল্লরাজ-দিগের সহিত মিলিত লইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের চেষ্টা করিতে-ছেন, আবার কখনও বা মনে হইতেছে যেন নাগসেন অথবা মিলিন্দ-রাজের সহিত বৌদ্ধদর্শনের গভীর তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা সম্রাট্ অশোকের শিলালিপি-ক্ষোদন, কারলী, এলি-ফাণ্টা ও অজন্তার গিরিগুহায় বিচিত্র কারুকার্য্য বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন, সারনাথের বিহার, নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রাধান্যকালের সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও কীর্ত্তির সহিত আপনাদিগকে একীভূত করিয়া ফেলিতেন। বৌদ্ধকাহিনীর আলোচনায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি-তন্ত্রী স্পন্দিত হইত। 'মহাযান' 'হীনযান' প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ ও নবপ্রকাশিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা' পুস্তক প্রভৃতি পাঠে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে কতকগুলি বৌদ্ধশ্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই ভাবে কিয়দ্দিন চলিবার পর স্বামীজি তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ প্রভাব হইতে ধীরে ধীরে বিমুক্ত করিয়া দিনকয়েকের জন্য 'হিন্দু অবতার, ভক্ত ও আচার্য্যগণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব' আলোচনায় নিয়োজিত করিতেন। রাম, কৃষ্ণ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, তুলসীদাস, রামদাস, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনসমূহ একে একে ছায়াচিত্রের ন্যায় তাঁহাদের নয়নসম্মুখে প্রতিভাসিত হইত ও কি করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের শক্তি ও প্রভাব পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবাসীকে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত ও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিত।

এইরূপে দেশকালপাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে তাঁহাদের কল্পনা সুদূর বৈৎলেহম নগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইত এবং

তাঁহারা সাধুশিরোমণি ঈশার জীবনলীলা আদ্যন্ত মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেন। রাখালগণের নিকট দেবদূত কর্ত্তৃক সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব-বার্ত্তা জ্ঞাপন হইতে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার তনুত্যাগ পর্য্যন্ত তদীয় জীবনের সমগ্র ঘটনাবলী একে একে তাঁহাদের মানসপটে সমুদিত হইত। মনে করিতেন—তাঁহারা যেন বরাহনগরের উদ্যানে উপবিষ্ট নহেন, খৃষ্ট-লীলাভূমি যেরুশালেমে উপস্থিত। মহর্ষি ঈশার প্রতি স্বামীজি এরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন যে, কথিত আছে কোন সময়ে Sistine Madonnaর একখানি চিত্র তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি শিশু খৃষ্টের পাদস্পর্শ করিয়াছিলেন। আর একসময়ে কোন শ্বেতাঙ্গ শিষ্যা অবতারবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় বলিয়াছিলেন "যদি আমি খৃষ্টের সময়ে পালেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে শুধু আমার নয়ন-ধারায় নহে কিন্তু হৃদয়ের শোণিত দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিতাম।"

এইরূপে উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস খৃষ্টআদর্শের আলোচনায় অতিবাহিত হইলে সকলে পুনরায় রামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন। জ্ঞান ও প্রেমের সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রস্রবণ—আদর্শের সেই অত্যুন্নতধাম—সে কি বিস্মৃত হইবার?—কখনই নহে। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিত ও অবিরল নেত্রবারি নির্গত হইত, কখনও বা তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনী হৃদয় প্লাবিত করিয়া সকলকে অতল প্রেমসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত করিত।

এই সময়ে মঠে সকল ধর্ম্মের বড় বড় পর্ব্বগুলি যথাবিহিত অনুষ্ঠান সহকারে সম্পন্ন হইত। যেমন, বড়দিনের সময় একটী ধূনি জ্বালিয়া সকলে ধূনির চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যীশুখৃষ্টের জন্মকথা, তাঁহার আবির্ভাববার্ত্তা প্রচার ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন। একবার

তাঁহারা 'গুডফ্রাইডে'র উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত বড় কৌতুকাবহ। সমস্ত দিবস উপাসনায় কাটিয়া গিয়াছে। আহার নাম-মাত্র—একপ্রকার উপবাস বলিলেই হয়, কারণ শুধু গোটাকতক আঙ্গুরের রস জলমিশ্রিত করিয়া সকলে এক এক চুমুক পান করিয়াছিলেন। সকলেরই হৃদয় ভাবাতিশয্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে দ্বারে একজন ইউরোপীয় অতিথির কণ্ঠ শুনা গেল "কে আছ, খৃষ্টের দোহাই, দ্বার খোল।" আনন্দে আত্মহারা হইয়া দশ-পনের জন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন, সকলেই ব্যাকুল একজন খৃষ্টানের মুখ হইতে ঐ দিনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন। কিন্তু লোকটী বলিল "আমি মুক্তি ফৌজের লোক। Crucifixionএর কথা জানি, কিন্তু 'গুডফ্রাইডে'র সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমরা দুটী পর্ব্ব পালন করিয়া থাকি—একটী খৃষ্টের জন্মদিন, আর একটী জেনারেল বুথএর জন্মদিন।" সন্ন্যাসীরা এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'সেকি, যেদিন তোমাদের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন সেদিনের বিষয় তুমি কিছু জান না!' তাঁহারা আশাভঙ্গে এতদূর ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন যে, পাদ্রী বেচারার হাত হইতে তাহার বাইবেলখানি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তাড়া করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায় একটু পরে তাঁহাদেরই মধ্যে আর একজন সে লোকটীর উপর দয়াপরবশ হইয়া অন্য দ্বার দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনেন এবং কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে দিয়া গোপনে তাঁহার পুস্তকখানি প্রত্যর্পণ করেন। লোকটি তাঁহাদিগের ব্যবহার দর্শনে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া দ্রুতগতি মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল 'ইহারা কারা? দেখিয়া বোধ হয় যেন খৃষ্টের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলী।'

কখনও কখনও নরেন্দ্রনাথ মঠের ভ্রাতাগণের নিকট 'সেণ্টফ্রান্সিস্' ও 'সেণ্ট ইগ্নেসিয়াস্ লয়োলা'র কাহিনী ও যে ভাবে 'ফ্রান্সিস্কান' ও 'জেস্যুইট' ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তদ্‌বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিতেন। আবার অনেক সময় 'ঈশানুসরণ' (Imitation of Christ) নামক পুস্তকের ভাব তাহাদের প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেন। এই পুস্তকখানি এ সময়ে মঠের সকলেরই প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল, পরে উহার স্থান শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা অধিকার করে। ক্রমে ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁহাদের এতদূর অনুরক্তি জন্মিয়াছিল যে তাহার মধুরত্ব অপরকে আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া ঐ গ্রন্থের কয়েকশত খণ্ড ক্রয় করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসর (১৮৮৭ খৃঃ অঃ) মঠে প্রথম শিবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে সকলে নরেন্দ্রের নবরচিত 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গান ধরিলেন; তারপর সারাদিন উপবাসে ও রাত্রিটা পূজা উপাসনায় কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে পূজাবকাশে নরেন্দ্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও উপদেশ ও নৈশ-নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া সকলের সমস্বরে 'শিব গুরু' 'শিবগুরু' বা 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে বিষম নৃত্য। সকলেরই গাত্রে ভস্ম বিলেপন ও নয়নে বৈরাগ্যের অনলাভা।—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

এই ভাবে বরাহনগরের মঠে দিন কাটিতেছিল। অনেক সময়ে আবার মঠে একটি শব্দও শ্রুতিগোচর হইত না। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকণ্ঠের মধুর 'মা, মা ব্রহ্মময়ী' শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। কখন কখন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে একাকী বিল্বতলে গান গাহিতে গাহিতে তিনি অন্তরের নিভৃততমরাজ্যে চলিয়া যাইতেন—বাহ্য-জগতের কোন ভাবই আর সেখানে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না।

এতক্ষণ আমরা মঠের ভিতরের কথা বলিলাম, কিন্তু ক্রমে মঠের সন্ন্যাসীদিগকে আবার অনেক বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল। সদানন্দ স্বামী বলিতেন, "সে সব কি গুলজারের দিনই গিয়াছে। এক মিনিট হাঁফ ছাড়বার যো ছিল না। দিনরাত বাহিরের লোক আসা যাওয়া করিতেছে। পণ্ডিতেরা আস্‌ছেন—ঘোর তর্ক-বিতর্ক চল্‌ছে, কিন্তু স্বামীজি একমুহূর্ত্তও তাহাতে কাতরতা, বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ কর্ত্তেন না। কি আধ্যাত্মিক বিদ্যা, কি সাধারণ বিদ্যা—তিনি সর্ব্বদা সকল বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

"বড় বড় পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। তাঁহারা সন্ন্যাসিগণের সহিত ধর্ম্ম বা দর্শনাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত বচন ও শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া গোঁড়ামীর ভিত্তি বেশ পাকা করিবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীজি প্রবল যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মতসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেন। তিনি দেখাইতেন যে, সংস্কৃত বিদ্যা বা শাস্ত্রের মূলসকল এ দেশীয় লোকের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনের উন্নতি-অবনতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। দেশকে উপেক্ষা করিয়া, দেশবাসীর প্রাণের নিকট হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া শাস্ত্রকে দেখিলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবোধ হওয়া দুঃসাধ্য। শাস্ত্র কতকগুলি মনগড়া কাল্পনিক নিয়ম মাত্র নহে, কিন্তু জাতির গঠন ও পরিপুষ্টিই তাহার মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

"আবার যখন খ্রীষ্টিয়ান পাদ্‌রীরা আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন মানসে তর্ক জুড়িতেন তখন তাঁহাদের উৎপাত নিবারণের জন্যও তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। কিন্তু সে ক্ষুরধার বুদ্ধির নিকট পাদ্‌রীরা অগ্রসর হইতে পারিবে কিরূপে? তাহাদের সকল বিতণ্ডা খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইত। অবশেষে যখন তাঁহারা তর্কে বিধ্বস্ত হইয়া